অক্টোবর ২০১৮ ❑ আশ্বিন - কার্তিক ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

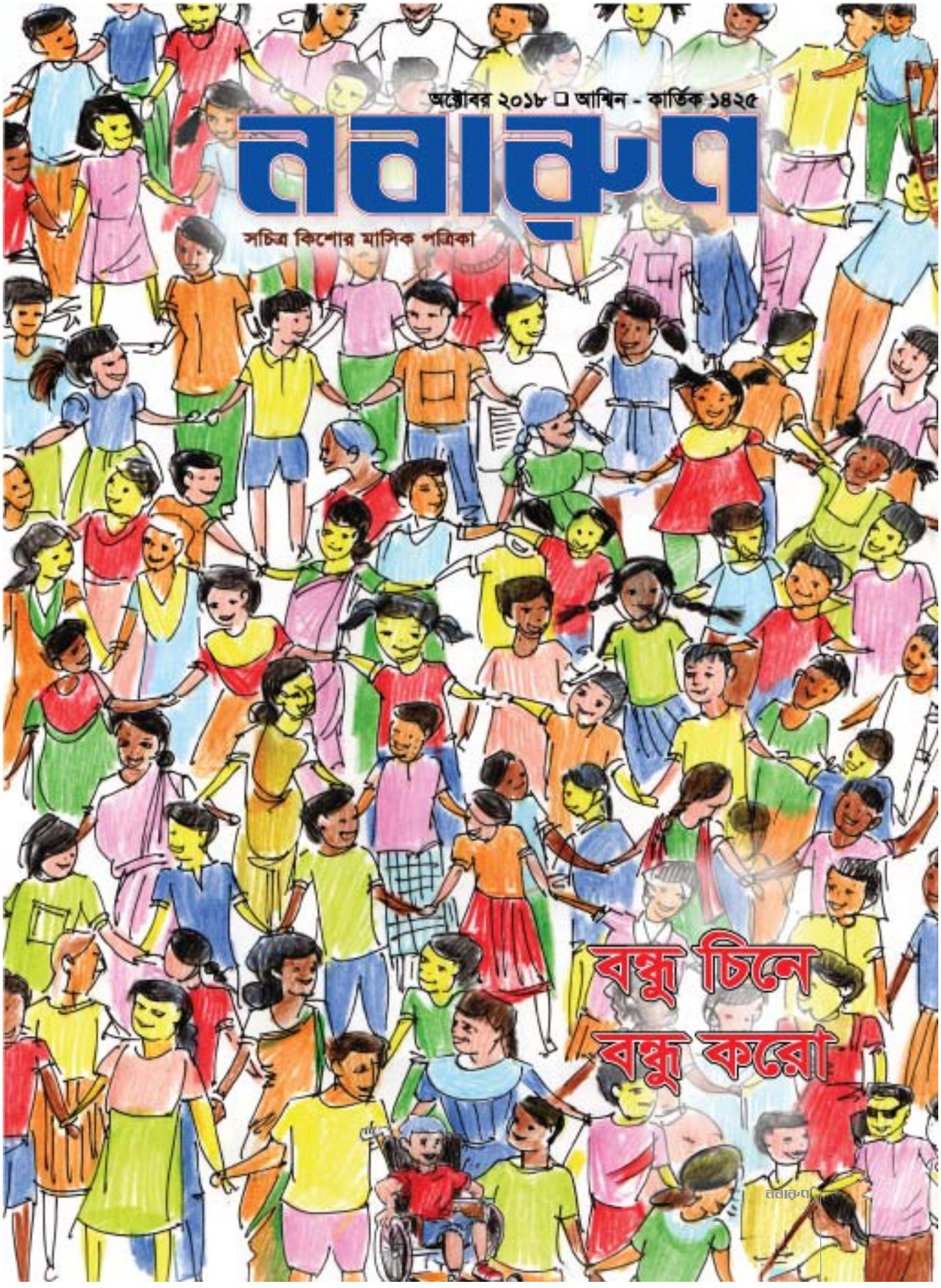

বন্ধু চিনে বন্ধু করো

শরীফ আহিয়ান যারিক, প্রথম শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা

আজমাইন, চতুর্থ শ্রেণি, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, রাজশাহী।

সম্পাদকীয়

যে বন্ধু বলে, স্মার্ট হতে চাইলে মাদক নিতে হবে। সে আসলে খুব ভুল বলে। এখনকার পৃথিবীতে স্মার্ট হতে চাইলে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। স্মার্ট মাত্রই নিয়মিত ব্যায়াম করে, সুষম খাবার খায়, নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে, খারাপ ব্যবহার করে না, হাসিমুখে কথা বলে, ধন্যবাদ দিতে জানে, সবার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, নিজের কাজে অবহেলা করে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্মার্ট মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। মাদক এর কোনো কিছুই করতে দেয় না। তাই মাদককে ভালো বলে যে বন্ধু, সে কিছুতেই বন্ধু হতে পারে না।

বন্ধুরা, বন্ধু চিনে বন্ধু করো। নবারুণের মতো হোক তোমাদের সব বন্ধু, কেননা নবারুণ চায় তুমি এবং তোমার বন্ধুরা স্মার্ট হও। ভালো থেকো।

সূচি

নিবন্ধ

০২ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
০৭ ছড়ায় ছড়ায় শেখ রাসেল/ সিরু বাঙালি
২৪ বন্ধু চিনে বন্ধু করো/ শাহানা আফরোজ
২৭ মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসায় আর নেই ভয় রাবেয়া ফেরদৌস
২৯ মাদকাসক্তদের চিকিৎসা আছে আশপাশেই জান্নাতে রোজি
৩৪ মাদককে না বলি চকলেট-কেক-আইসক্রিমকে বলি হ্যাঁ/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৩৬ চকলেট, কেক ও আইসক্রিম খেয়ে দাঁতের যত্ন মো. জামাল উদ্দিন
৪২ রহস্যময় স্থাপত্য/ খালিদ বিন আনিস
৫২ একজন মহান মানুষের গল্প/মমতাজ খান
৫৪ ওদের যত চাওয়া/রুমান হাফিজ
৫৮ আকাশের ওজন কত?/রবিউল কমল
৬১ বিজয় ফুল/ মেজবাউল হক
৬২ বুদ্ধির খেলা/আনোয়ারা বেগম
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

গল্প

০৫ শেখ রাসেল ও সুতোকাটা ঘুড়ি/ রফিকুর রশীদ
০৯ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
১৫ রবির আলোয়/ পুলক রাহা
১৮ রুম্পার দিনগুলো/ রিমা লিমা
৩০ আমার বাজানরে ফিরায়ে দ্যাও.../ মুস্তাফা মাসুদ
৩৭ দীপনের রোজনামচা/ সৈয়দা নাজমুল নাহার
৩৯ ছোটো বোনের মেহমানদারি/ জাজাফী
৪৫ ছয় ফুট মশা/ স. ম. শামসুল আলম
৪৭ অ্যানির চড়ুইবন্ধু/ শাম্মী তুলতুল
৪৯ খোলা হাওয়া/ শম্পা প্রদীপ্তি
৬০ ফুলপরি/সারমিন ইসলাম রত্না

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মোঃ এনামুল কবীর **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ **সম্পাদকীয় সহযোগী:** তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা, মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

সাদিয়া ইফফাত আঁখি

নবারুণ এমন একটি পত্রিকা যেখানে লেখকের প্রতিটি মেইল, চিঠির জবাব দেওয়া হয়। নবারুণের উদ্দেশ্য হলো লেখক ও পাঠকের মধ্যে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলা।

ফেসবুক মতামত

সাঈদ বারী: লেখা ছাপা হওয়া সংখ্যাটা কী সৌজন্য পাওয়া যাবে না?

নবারুণ: লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই লেখকের ঠিকানায় নবারুণ পৌঁছে যায়।

মাঈন উদ্দিন: পত্রিকাটির দাম কত? ঠিকানা?

নবারুণ: পত্রিকাটির দাম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ২০ টাকা। **ঠিকানা:** চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

আমির আলী: প্রবাসে বসে নিয়মিত অনলাইনে নবারুণ পড়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কী?

নবারুণ: হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি অনলাইনে নিয়মিত নবারুণ পড়তে পারবেন। এরজন্য ওয়েব সাইট: www.dfp.gov.bd, Facebook: Nobarun Potrika এবং Google Playstore থেকে 'Nobarun' Install করুন।

জোবায়ের হোসেন রাফি: শেষ তারিখ কবে লেখা পাঠানোর?

নবারুণ: যে- কোনো বিশেষ দিবস বা মাস উপলক্ষে লেখা পাঠাতে চাইলে অনুগ্রহ করে সেই দিবস বা মাসের কমপক্ষে দুই মাস আগে লেখা পাঠালে সুবিধা হয়।

কায়েস শামী: কোন বিষয়ে লেখা পাঠাব?

নবারুণ: নবারুণ একটি সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা। এখানে কিশোর বয়সীদের উপযোগী লেখা ছাপানো হয়।

কবিতার হাট

০৩ মোজাম্মেল হক নিয়োগী
০৪ সুহৃদ সরকার/ বোরহান মাসুদ
০৮ আজহারুল হক/ রেবেকা ইসলাম
১৩ খায়রুল আলম রাজু
১৪ মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন/ নাসির ফরহাদ আলিম রহমান
২১ মৃদুল ইসলাম
২৩ রমজান আলী রনি
২৮ মো. ইহসান আহমেদ
৪০ জাফরুল আহসান
৪১ বাসুদেব খাস্তগীর/ শামসুল করীম খোকন মো. রিমন হোসাইন
৪৪ চান মিয়া চান্দু/ সৈকত সমীর সুহৃদ
৫৭ জসীম মেহবুব/আহসানুল হক
৫৯ গিয়াস উদ্দিন রূপম/বিএম বরকতউল্লাহ্ মাযহারুল ইসলাম অনিক

কমিক্স

২২ ফুটবল/ কাজী তাবাস্‌সুম আহমেদ

আঁকা ছবি

২য় প্রচ্ছদ: শরীফ আহিয়ান যারিক/ আজমাইন
শেষ প্রচ্ছদ: নূরতাজ জাহান জুঁই
০৯ দিশা হাসান
১৪ দৃপ্ত ওয়ালিদ
৩৭ দ্যুতি অরণি প্রসূন
৫৭ মো. আমিমুল ইহসান বসুনীয়া

নবারুণ পড়

ওয়েব সাইট: www.dfp.gov.bd
ফেসবুক: nobarun potrika
মোবাইল অ্যাপ: Google Playstore থেকে 'Nobarun' Install করো।

বিকাশ ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে গ্রাহক চাঁদা দিলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে নবারুণ।

আগস্টের যিশু

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

সারাটি বাড়ি কেঁপে উঠল হঠাৎ
বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হলো একটি বাড়ি
সারি সারি লাশ পড়ে আছে এখানে সেখানে
রক্তের স্রোত মিশেছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলে
রক্তে ভিজে গেছে বাংলার সমস্ত মাটি, ধূলিকণা।

তখন একটি শিশু বাঁচার জন্য ছোটে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে
বাঁচার জন্য কত আকুতি-মিনতি তার
কবুতরের ঘরের পাশে লুকোয়, তারপর অন্য ঘরে
সারি সারি লাশ দেখে বুক ভাসায় চোখের জলে
ভয়ে আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে আসে আঙিনায়
ভাবে, আমি তো শিশু, আমাকে মারবে কেন?

আর তখনই ছুটে আসে এক পাষাণ দানব
দাঁত কেলিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসে অবিরাম
শিশুটি বলে, আমাকে মেরো না, মেরো না আমাকে।
এই অবোধ শিশুর কান্নায় দানবের মন কি আর গলে?

সে শিশুটির হাত ধরে শক্ত হাতে
ক্রুশবিদ্ধ হতে চলেছে যেন আগস্টের এক যিশু
দুরুদুরু বুক, করুণ সুরে শিশুটি বলে, 'আমি মায়ের কাছে যাব'

'আয় তোকে নিয়ে যাই তোর মায়ের কাছে', দানবটি বলে
হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে যায় মায়ের কাছে

এ-ঘরে মায়ের লাশ, সিঁড়িতে পড়ে আছে বাবার নিথর দেহ
ভাই-ভাবিদের রক্তমাখা প্রাণহীন দেহগুলোর পাশে
সেখানে দাঁড় করিয়ে বলে, 'যাবি তোর মায়ের কাছে?'
তারপর... ঘোর অন্ধকার... নিভে যায় দুটি চোখ
বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয় একটি নিষ্পাপ অবোধ শিশুর
কোমল প্রাণের বুক।

রাসেল ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে
এই ঘুম না জাগার ঘুম, এই ঘুম অনন্তকালের ঘুম
রাসেল আর কোনো দিন জাগবে না, কোনো দিনও না।

সেদিন বত্রিশের সবুজ পাতারা কান্নায় পড়েছিল ঝরে
সারাটি দেশ হয়েছিল স্তব্ধ, কোলাহলহীন মরুভূমি
পাখিরা ভুলে গিয়েছিল সুর, ফুলেরা ছড়ায়নি সুবাস
বাতাসে বাতাসে ভেসেছিল রাসেলের করুণ কান্নার সুর
পাখিরা বলেছিল, রাসেল আর জাগবে না কোনো দিন
রাসেল আর কোনো দিন আসবে না ফিরে; কোনো দিনও না।

মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে যে শিশু সে আর কোনো দিন বড়ো হবে না
অনন্তকাল সে শিশু হয়ে থাকবে; রাসেল অম্লান চির শিশু
রাসেল পঁচাত্তরের আগস্টের নিষ্পাপ যিশু।

রাসেল নামের সেই ছেলেটি

সুহৃদ সরকার

রাসেল নামের ছোট্ট একটি ছেলে
উঠোন জুড়ে বেড়ায় হেসে খেলে।
বল, মার্বেল, ডাংগুলি আর ঘুড়ি
সারা বিকেল শুধুই ওড়াওড়ি।

বুকের ভেতর স্বপ্ন ছিল বোনা
অনেক বড়ো হবে রাসেল সোনা।
আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ ভোরে
বাড়ির ভেতর শত্রু প্রবেশ করে।

চালায় গুলি শ্রাবণ ধারার মতো
সেই গুলিতে বাবা হলেন হত।
মা-মণিটার উড়ল মাথার খুলি
রক্তে ভিজে গেল বইয়ের ঝুলি।

ঘরের ভেতর বাড়ল ভাইয়ের লাশ
শুনল সবাই শত্রুর উল্লাস।

রাসেল সোনাও মুখ থুবড়ে পড়ে
একটি প্রাণও রইল না আর ঘরে।
সেই বাতিটা তেমনি আজও আছে
আজ শুধু নেই ছোট্ট রাসেল সোনা
স্বপ্ন মাঠে হয়নি তো বীজ বোনা।

সেই রাসেলকে আজও আমি খুঁজি
চষে বেড়াই এ পাড়া ও পাড়া
একটিবারও দেয় না তো সে সাড়া
চমকে উঠি জাগল রাসেল বুঝি।

রাসেল তোমার জন্যে জেগে থাকি
বাংলাদেশের আমরা হাজার প্রাণ
রক্ত দিয়ে রাখতে দেশের মান
তোমার ছবি বুকের ভেতর রাখি।

ফুল ফুটেছে চাঁদ উঠেছে

বোরহান মাসুদ

ফুল ফুটেছে থোকা থোকা
চাঁদ উঠেছে ওই
পড়ার ঘরে ছড়িয়ে আছে
কলম-খাতা বই।
পায়রাগুলো খোপের মাঝে
রাত্রি তখন আটটা বাজে
বই-খাতা সব বিছিয়ে রেখে
রাসেল গেল কই।
রাসেল সোনা মিষ্টি চপল
হাসির কলরোল
হাসির দোলা দুলদুলিয়ে
ফুল ডালে দেয় দোল।
এমন হাসির মিষ্টি ছেলে
কোথায় গেল পাঠ্য ফেলে
হন্যে হয়ে খুঁজি তাকে
কে বাঁধাল গোল।
গোল বাঁধাল দস্যু সেনা
পাকবাহিনীর দল
সেই শোকে আজ কাঁদল স্বদেশ
ভাসল চোখের জল।

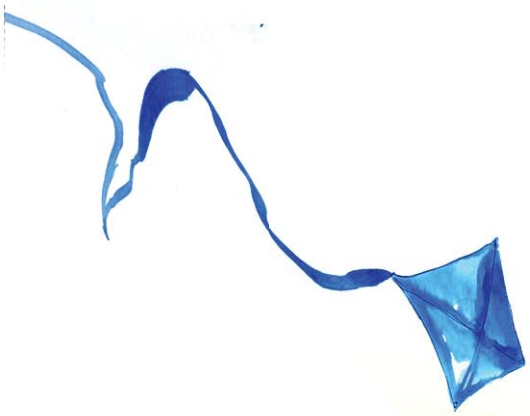

শেখ রাসেল ও সুতোকাটা ঘুড়ি

রফিকুর রশীদ

সুতোকাটা ঘুড়িদের রাজ্যে বিরাট এক জনসভা। আকাশ ভরা পূর্ণিমা চাঁদ। বাতাসে ফুলের সৌরভ। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হচ্ছে রাতের বেলা পাখির গুঞ্জন। কোকিলের কুহুতানও কী শোনা যাচ্ছে? বুলবুলি, ময়না, টিয়া, দোয়েল, ফিঙে সবাই কী সুর ধরেছে? এত আনন্দ কোলাহল কোথায় জমে ছিল কে জানে। এ কি তবে উত্তরের হিমালয় চূড়া থেকে নেমে আসা বন্ধন হারা ঝরনাধারার গুঞ্জরণ? নাকি দক্ষিণের সমুদ্র থেকে উৎসারিত তরঙ্গ উচ্ছাস?

এরই মাঝে সাতই মার্চের কলরেডি মাইক্রোফোনের গমগমে ধ্বনি ভেসে আসছে। বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত প্রবাহিত জনসমুদ্রের গর্জন কি ছিল এমনই মেঘমন্দ্রিত? সুতোকাটা ঘুড়িদের জনসভা কানায় কানায় পূর্ণ। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্র দেব, মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ পণ্ডিতেরা নিজ উদ্যোগে সুতোকাটা ঘুড়িদের ইশকুল ছুটি ঘোষণা করেছেন। ফলে জনসভায় শিশু-কিশোরের কর্নার কলকাকলি মুখর। সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীনসহ আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া নিজে এসেছেন এই জনসভার নিউজ কাভার করতে।

পদ্মফুলের আকৃতিতে সাজানো মঞ্চে বসে আছেন জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এইচ এম কামরুজ্জামান, এম মনসুর আলী। এদের মাঝখানে মধ্যমনি হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন জাহানারা ইমাম।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার জন্য ধীর পদক্ষেপে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ায় এক কিশোর। মাথা ভর্তি চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ। সারা মুখমণ্ডল পরিপূর্ণতায় ভরাট হয়ে ওঠেনি। ঠোঁটের উপরে গোঁফের রেখা। যদি চশমা পড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবের অনুকৃতি বলে যে কেউ চেঁচিয়ে উঠত। আঙুল উঁচিয়ে বলত, ওই যে আমাদের নেতা ফিরে এসেছেন, আমাদের বঙ্গবন্ধু।

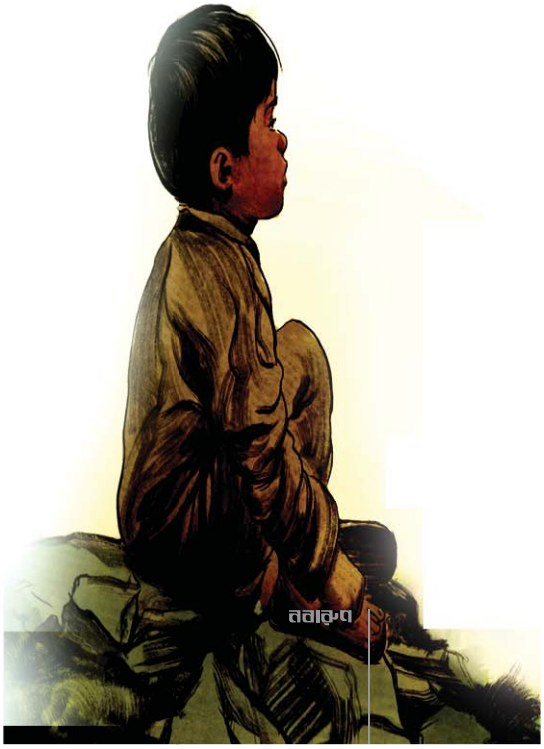

মাইক্রোফোন কড়কড় করে ওঠে। কী আশ্চর্য কিশোর কণ্ঠে এমন বজ্রনির্ঘোষ হলো কী করে। শ্রোতা সাধারণ কান খাড়া করে- আমাদের শুনতে ভুল হচ্ছে না তো। এ যে সেই আকাশ কাঁপানো কণ্ঠ। এ যে সেই সাগর উপচানো কণ্ঠ। ওই কণ্ঠ কি এখনই গর্জে উঠবে 'এবারের সংগ্রাম....? নাহ, মুক্তির সংগ্রাম' 'স্বাধীনতার সংগ্রাম তো বলা হয়ে গেছে সেই কবে। এতদিন পরে কী এমন নতুন সংগ্রামের কথা বলবে। আবারো সংগ্রাম? সারাজীবন শুধু সংগ্রামই বলবে? জীবন মানেই সংগ্রাম?

মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থাপক শুরু করে

আমি শেখ রাসেল।

নিজের নাম ঘোষণার পর চারিদিকে তাকিয়ে সবার চোখে-মুখে উদ্ভাসিত প্রতিক্রিয়া পাঠের চেষ্টা করে। কোথাও উচ্ছাস, কোথাও সমবেদনা, কোথাও বা কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা।

অত্যন্ত ধীরে বাক্য গুছিয়ে কথা বলে রাসেল।

শেখ মুজিবের ছেলে, শুধু এই পরিচয়ের অধিকারে আজ এখানে আমি আসিনি। এটা সুতোকাটা ঘুড়িদের সমাবেশ, আমি এসেছি সুতোকাটা ঘুড়ির অধিকারেই। আমার জীবনের পূর্ণতার সুতো ছিঁড়ে গেছে সেই অন্ধকার পঁচাত্তরে। 'মুজিবের ছেলে' এছাড়া কীইবা অপরাধ ছিল আমার। না, আজ সে প্রশ্ন আমি আপনাদের সামনে তুলতে চাই না। আপনারা কেউই জীবন লাটাইয়ের সবটুকু সুতোর পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেননি। আমরা কেউ পারিনি। তাই আমরা সবাই সুতোকাটা ঘুড়ি।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যে নেতারা বিচক্ষণ নেতৃত্ব দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন, তাঁদেরও জীবন লাটাইয়ের সুতো, মাঝপথেই ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে নির্মমভাবে। সুতোকাটা ঘুড়ি হয়ে তাঁরাও এখানে আছেন। কাটা সুতো জোড়া দিয়ে নতুন প্রাণসঞ্চারে দক্ষ মহীয়সী জননী সাহসের প্রদীপ্ত শিখা জাহানারা ইমাম এখানে এসেছেন অতিথি হয়ে। একাত্তরের দেখানো পথে দেশও চলতে পারেনি, নানাভাবে লাগাম পড়ানো হয়েছে বার বার। এই সুতোছেঁড়া জীবন দিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে চাই। বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া যারা দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই নেতাদের অনুরোধ জানাই বঙ্গবন্ধুকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে আপনারা কি আবারো নেতৃত্ব দিতে পারেন না নতুন যুদ্ধের?

শহিদ জননী ক্যান্সার আক্রান্ত শরীর নিয়েও ধীরে ধীরে মাইক্রোফোনের সামনে এসে বলেন, রাসেলের আবেগকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। প্রায় নিভে যাওয়া আগুন আমি আবার জ্বেলে দিয়েছি, থেমে যাওয়া যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট খুলে দিয়েছি। এ যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। আর এ যুদ্ধের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আমি জানি সুতোকাটা ঘুড়ির জীবন আদৌ কারো কাম্য নয়। তবে এটুকু আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি চলমান এ যুদ্ধে যদি সাফল্য আসে, তাহলে সুতোকাটা জীবনের জন্যে আর দুঃখ থাকবে না।

জাহানারা ইমামের বক্তৃতা চলতেই থাকে।

এরই মাঝে সুতোকাটা ঘুড়িদের ইশকুলের এক খুদে শিক্ষার্থী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তার প্রিয় টিচার মুনীর চৌধুরীর কাছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছেন।

তবু তার আদুরে ডান হাতটা বাড়িয়ে দেন শিক্ষার্থীর মাথার উপরে। সে জানতে চায়, আচ্ছা স্যার, বঙ্গবন্ধুকে দেখছি না কেন এখানে?

টিচার যেন চমকে ওঠেন এ্যাঁ, তাই তো।

তিনি কি সুতোকাটা ঘুড়ি হননি?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে টিচার বলেন,

না, সুতোকাটা ঘুড়ি তিনি হননি মা। তিনি হয়েছেন ঘাসফুল। দেশের মাটির সঙ্গে মিশে থাকেন সারাক্ষণ। তিনি সকলের সঙ্গেই আছেন।

কী বুঝে খুদে শিক্ষার্থীও গোলাপ ফোটার মতো সুরভিত হাসি ছড়িয়ে দেয়। ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানায়। যেন সে খুব বুঝতে পেরেছে কুচক্রী কাপুরুষ সৈনিকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েও চিরসবুজ বঙ্গবন্ধু কেন সুতোকাটা ঘুড়ি না হয়ে ঘাসফুল হয়েছেন।

এসো বই পড়ি

ছড়ায় ছড়ায় শেখ রাসেল

সিরু বাঙালি

শেখ রাসেল একটি শিশু, নামটি শুনলেই অন্যরকম একটা অনুভূতির জন্ম হয়। মন দুঃখ ভারাক্রান্তে ভারী হয়ে যায়। পুরো বাঙালি এই দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করেন। আ. ফ. ম. মোদাচ্ছের আলী, মা মাটি মাতৃভূমি মানুষকে হৃদয়ে ধারণ করা ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক। ২০১৮ মহান একুশের বইমেলায় তার রচিত ছড়াগ্রন্থ 'ছড়ায় ছড়ায় শেখ রাসেল'। প্রকাশক দাঁড়িকমা প্রকাশনী। অনন্য সুন্দর প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ। বইটির প্রতিটি ছড়া রাসেলের স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস, যা ছড়াকার ছন্দে গেঁথেছেন।

ছড়াকার জানান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'শেখ রাসেল' গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা লিখিত রাসেলের স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনকে ধারণ করে ছড়াগুলো লেখা। যেমন বইটির প্রথম ছড়া জন্ম-তে আছে:

ভোটের কাজে বাবা তখন
চট্টগ্রামের হিলে
জন্ম হলে আদর দিল
বোন ফুফু সব মিলে।

বঙ্গবন্ধু তখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় চট্টগ্রাম ছিলেন। নামকরণ ছড়ায় ছড়াকার লেখেন—

বাবার প্রিয় দার্শনিক এক
বার্ট্রান্ড রাসেল নাম
পাঁচ ভাই-বোনের সবার ছোট
নামটির অনেক দাম।

এরপরে হাসুবুবুর হাত ধরে রাসেলের হাঁটা শেখা, ছোট্ট রাসেল 'ওল্লা', (কালো পিঁপড়া) খুব ভয় পেত এবং তার শিশু হৃদয়ে ভুট্টো ছিল ওল্লা পিশাচ যা ছড়াকার লিখেছেন 'ওল্লা ভুট্টো' ছড়ায়। রাসেল পায়রা নিয়ে খেলত, বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা উড়াতেন। ঘরে পায়রার মাংস রান্না হলে রাসেল খেত না। যা উঠে এসেছে 'পায়রা' ছড়ায়। বাবার জন্য রাসেলের আকুতি ছড়াকার তুলে এনেছেন 'ঘর' ছড়ায়। টমি নামের বাসার কুকুরটি তার খুব প্রিয় ছিল তাও উঠে এসেছে এই গ্রন্থভুক্ত ছড়ায়।

এইভাবে গ্রন্থভুক্ত ত্রিশটি ছড়ার মধ্যে, ও পুলিশ, কাল হরতাল, জয় বাংলা, বন্ধু ইমরান ও আদিলকে নিয়ে

খেলার সাথি ছড়া, হাসু আপুর রান্না করা দুধের সেমাই যা রাসেলের খুব প্রিয় ছিল, ছড়াকার সহজ ভাষায় তা ছড়ার মাধ্যমে তুলে এসেছেন। রাসেলকে কেউ প্রশ্ন করলে বড়ো হলে সে কী হতে চায়– ও বলত আর্মি হবে। লেখক এটি তুলে এসেছেন লক্ষ্য ছড়ায়, যার শেষ দুটি লাইন হৃদয়কে নাড়া দেয়–

'উর্দি পরা কু সেনারা মুছে দিলো আশা
যায় কী তাতে? পাচ্ছ রাসেল কোটি ভালোবাসা।

রাসেলের প্রিয় টিকটিকি ডিম, মাছ ধরার শখ, গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় প্যারেড করিয়ে বন্ধুদের লজেন্স খেতে দেওয়া ইত্যাদি অনেক কিছুই সাবলীলভাবে ছড়াকার তুলে এনেছেন। স্মৃতি ছড়াটি খুব মনে দোলা দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর আমাদের রাসেল সোনা প্রবন্ধে লিখেছেন– রাসেলের জন্য বিদেশে থাকাকালীন কেনা খেলনা জামা-জুতো কিনে রেখেছিলেন। ছড়াকার স্মৃতি ছড়ায় লিখলেন–

খেলনা জুতো আছে কেনা
সব হলো আজ স্মৃতি
তোমার জন্যে লাখো আদর
তোমার জন্যে প্রীতি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর মা পরিবারের নারী সদস্য ও শিশুরা পাকিস্তানিদের কাছে গৃহবন্দি ছিলেন। তখন আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম রূপকার রাসেলের ভাগ্নে সজীব ওয়াজেদ জয় ছিলেন এক্কেবারে ছোট্ট একটি বাচ্চা। যুদ্ধের দামামায় গোলাগুলি, বোমার শব্দ সে সহ্য করতে পারত না। কান্নাকাটি করত। তখন রাসেল জয়ের কানে তুলো গুঁজে দিত। ছড়াকার জয় এর জন্য ছড়ায় অপূর্ব ছন্দে তুলে এনেছেন এইভাবে–

একাত্তরে যুদ্ধ শুরু বন্দি রাসেল ঘরে
গুলির আওয়াজ শুনে মামা কেমন জানি করে।
ভাগ্নে জয় এর জন্য ছিল খুব বেশি তার আদর
বুকের ভেতর রাখত রাসেল ভালোবাসার চাদর।
যুদ্ধ দিনে শব্দ অনেক আগুন গোলা-গুলি
জয়ের কানে তুলো দিতে যায় না রাসেল ভুলি।

ছড়া গ্রন্থটিও উৎসর্গ করা হয়েছে রাসেলের প্রিয় ভাগিনা– সজীব ওয়াজেদ জয়কে। আমার বিশ্বাস এটি যথার্থ অর্থেই সম্মানজনক হয়েছে। বইটি আপামর পাঠকের মন জয়ে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শরৎ এলে

আজহারুল হক

শরৎ এলে নীলাকাশে
শুভ্র মেঘের ভেলা ভাসে
মাঠে মাঠে সবুজ হাসি
কাশের ছড়া রাশি রাশি।

শরৎ এলে দূর্বাদলের
শিশিরেতে মুক্তা জ্বলে
জোছনা ভরা নিশির পরে
প্রভাতকালে শিউলি ঝরে।

শরৎ এলে খালে বিলে
ভরে উঠে শাপলা ফুলে
ঢোল কাঁসার বাজনা বাজে
সবাই মাতে শারদ সাজে।

আমি

রেবেকা ইসলাম

একটু কাগজ পেলে আমি অনেক কিছু আঁকি
শরৎকালে শিশিরভেজা মিষ্টি ভোরের বেলা
বর্ষাকালে বিষ্টি-মাটি হচ্ছে মাখামাখি
বসন্তে ওই বাগান জুড়ে রঙিন ফুলের মেলা।

একটু রঙের বাটি পেলে কত্ত কিছু আঁকি
শহর জুড়ে ইট পাথরের দালান সারি সারি
রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা করছে হাঁকাহাঁকি
ভরদুপুরে একলা ছাদে উড়ছে মায়ের শাড়ি।

একটু তুলির ছোঁয়ায় আমি মনটা ভরে আঁকি
আমার দেশের সবুজমাখা শান্ত শ্যামল গাঁও
জারুল ডালে লেজ দুলিয়ে ডাকছে দোয়েল পাখি
উতাল নদীর তীরটি ঘেঁষে সুজন মাঝির নাও।

একটু ছুটি পেলে আমি শুধুই ছবি আঁকি
সবুজ রঙের পতাকাকে লাল সুরুজে ঢাকি।

কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে?

ধারাবাহিক গল্প

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

দিশা হাসান, একাদশ শ্রেণি, মেট্রোপলিটন কলেজ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

আমরা সবাই বসে আছি। কিন্তু বড়ো চাচা বা মুহিব চাচার কোনো খবর নেই। শিলা আপা বড়ো চাচাকে ফোন করতেই সোফার কুশনের নিচে ফোন বেজে উঠল। তার মানে বড়ো চাচা ফোন রেখে গেছেন। মুহিব চাচার নম্বর আমাদের জানা নেই।

এখন কী করা? এর আগে তো কখনো এমন হয়নি। আমরা আরো অপেক্ষা করব, নাকি চলে যাব কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় ছোটো চাচা বের হলেন তার ঘর থেকে। এতগুলো ছেলেমেয়েকে ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে ছোটো চাচার মায়া হলো। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন। বললেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার জবানে একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরব।

ছোটো চাচা পড়তে লাগলেন—

বাসু আমার বন্ধু। পুরো নাম বাসুদেব মুখার্জি। ও তখন একটি পত্রিকায় কাজ করত। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও লিখত। ওর লেখা পড়ে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা উদ্বুদ্ধ হতো, মনে সাহস ফিরে পেত।

একদিন বাসু এল আমার কাছে। বলল—তোমাদের দল তো কাল মানিকগঞ্জ যাচ্ছে, তাই না?

আমি বললাম-হ্যাঁ, মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার ল্যাসড়াগঞ্জে একটা অপারেশন আছে আমাদের।

তোমাদের সাথে একটা ছেলে দেবো। ওকে ওর গ্রামে পৌঁছে দেবে।

কোন গ্রাম?

সেটা ছেলেটাই ভালো বলতে পারবে।

ছেলেটার সম্পর্কে আরো কিছু জানার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু প্রশ্ন করলাম না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমরা কেমন যেন অল্পভাষী হয়ে গেছি। অনেক কিছু জানার ইচ্ছে মনে পুষে রেখে চুপ করে থাকি।

ছোট্ট একটি ছেলে। নাম টিটু। বয়স আট কি নয়। ওকে জিজ্ঞেস করলাম-তুমি একা কেন?

পাকিস্তানিরা আমার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে। মৃদুস্বরে বলল ও। কষ্টে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠল।

আমরা একটা বড়ো ছইওয়ালা নৌকায় মানিকগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা ছয়জন। একজন মাঝি। দরকার হলে আমরাই তার সঙ্গে হাল ধরি, বৈঠা চালাই। মাঝি লোকালয়ের ভেতর দিয়ে এমনভাবে নৌকাটা নিয়ে যাচ্ছিল, যেন কেউ সন্দেহ না করে যে নৌকার ভেতরে মুক্তিযোদ্ধা আছে।

সামনে যুদ্ধ, তাই ছেলেটার দিকে কারো মনোযোগ ছিল না। কিন্তু আমি তাকে কেন যেন এড়াতে পারিনি। আমি তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। সুযোগ পেয়ে ছেলেটাও আমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে।

নৌকা চলছে ধীর গতিতে। ছেলেটা সবুজ গাছ, গাছের ডালে গান করা পাখির দিকে তাকিয়ে বলল—স্যার, আমি স্বাধীনতা দেখব।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম-অবশ্যই দেখবি। তুই তো সব হারিয়েছিস স্বাধীনতার জন্যই, স্বাধীনতা তোকে দেখতেই হবে।

আমরা খুব সাবধানে এগোচ্ছিলাম। বিপদ এড়াতে প্রায়ই যেতে হচ্ছিল ঘুরপথে। সাভার পৌঁছতে লেগে গেল তিন দিন। এই তিন দিনেই টিটু আমাকে খুব আপন করে নিয়েছে। আমিও তাই। টিটু আগ্রহ নিয়ে আমার কাছ থেকে রাইফেলে গুলি ভরা, তাক করা, ট্রিগার টেপা শিখে নিয়েছে। গ্রেনেডের মুখ খোলার পদ্ধতি, গ্রেনেড ছোঁড়ার কৌশলও বাকি নেই। প্রথম প্রথম আমি ওকে ধমক দিতাম। কিন্তু দমবার পাত্র ও নয়। ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই থাকত। অবশেষে শেখাতেই হতো।

সাভারের কাছে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম, সামনে পাকিস্তানি সেনারা আছে। ওরা আমাদের নৌকা দেখে ফেলেছে। এখন পিছিয়ে গেলে সন্দেহ করবে। স্পিডবোট নিয়ে এসে আমাদের ধরে ফেলতে পারে। মাত্র ছয়জন মানুষ আর সামান্য অস্ত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। আমরা ভিন্ন কৌশল নিলাম। রাস্তার দুই পাশেই বড়ো বড়ো গাছ। গাছের তলায় গলা সমান ঝোপ। ঠিক করলাম, ঝোপের মধ্যে অস্ত্র হাতে একজন নেমে যাবে। ঝোপের মধ্যে থেকে উলটো দিকে গুলি ছুঁড়বে।

স্বাভাবিকভাবেই আর্মিরা সেদিকে ছুটবে। তখন আমরা বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ চালাব। টিটু ফস করে বলে উঠল—স্যার, আমি যাব।

আমি ধমকে উঠলাম—চুপ!

ধমকে সে টলল না। বলল— আমি যাবই।

তুই যুদ্ধের কী বুঝিস?

এখানে যুদ্ধের তো কিছু নেই। এই ঝোপের মধ্যে আমি নামলে ওরা আমাকে দেখতেই পাবে না।

টিটুর যুক্তিটা ভালো, কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া যায় না। বললাম-দ্যাখ তুই বাপ-মা হারিয়েছিস। নিজে বেঁচে থাকলে অন্তত স্বাধীনতাটা দেখে যেতে পারবি।

সে বলল— আপনার কথা শুনলে আমাকে আর স্বাধীনতা দেখে যেতে হবে না। যদি ওরা নৌকা আক্রমণ করে বসে, তাহলে আমাকে কি বাঁচিয়ে রাখবে? স্বাধীনতা দেখতে হলে এখন ওদের ওপর আমাদের জয়ী হতে হবে। তাই এখন আমাকেই নেমে যেতে হবে।

তোকে আমি যেতে দেবো না।

অন্য কেউ গেলেও আমি তার সঙ্গে যাব।

টিটুর জেদের কাছে হার মানতে হলো। সে যখন যাবেই, তখন একাই যাক। তাতে ওদের দৃষ্টি এড়ানো সহজ হবে।

একটা এলএমজি নিয়ে নেমে গেল টিটু। মাত্র সে ঝোপের মধ্যে থেকে একটু মাথা উঁচু করেছে, অমনি এক ঝাঁক গুলি শিলা বৃষ্টির মতো ওর গায়ে বর্ষিত হলো। গুলির তোড়ে সে মাটি থেকে তিন-চার ফুট ওপরে উঠে আবার ধপ করে পড়ল মাটিতে। সবুজ ঘাসে ওর বুকের লাল রক্ত ছড়িয়ে যেন আঁকা হলো বাংলাদেশের মানচিত্র।

ওকে আমরা নৌকায় তুলে আনতে পেরেছিলাম। ও আমার কোলে মাথা রেখে বলেছিল-স্যার পানি।

চারদিকে ভরা বর্ষার থইথই পানি। হাত ভরে সে পানি টিটুর মুখে তুলে দিলাম। 'স্বাধীনতা দেখব। স্যার, আমি স্বাধীনতা দেখব।' এ কথা বলতে বলতে টিটু মরে গেল। ওর রক্তাক্ত দেহটা কোলে নিয়ে আমি নিথর হয়ে বসে রইলাম। অন্য সবাই টিটুর জন্য আর্তনাদ করে কাঁদছিল। কিন্তু কেন জানি আমার ভেতর থেকে কোনো আর্তনাদ বের হলো না। টিটুকে আমরা বাড়িতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতা দেখাতে পারিনি। স্বাধীনতা এসেছিল আরো অনেক পরে।

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক (ডানে) পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান-কে (বামে) হত্যা করে বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছেন।

ছোটো চাচার পাঠ শেষ হলো। আমাদের ব্যথিত মুখ। কারো কারো চোখে অশ্রুবিন্দু। টিটুর জন্য আমাদের বেদনা। এক ঝাঁক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে ছেলেটা মরে গেল। স্বাধীনতা দেখার কত সাধ ছিল ওর ছোট্ট বুকে!

ছোটো চাচা বললেন, এমনই অজস্র টিটু আমাদের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে। তাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা এখন আমি, তুমি, আমরা সবাই ভোগ করছি। কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না। তোমাদের জানতে হবে সেই টিটুদের কথা। জানতে হবে আমাদের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস।

ছোটো চাচার গল্প তো শেষ হলো। এখন আমরা কী করব? ছোটো চাচা বললেন, তোমরা খুব বোকা। তোমাদের মুহিব চাচার নম্বরে ফোন করো। দেখবে দু'জনকেই পেয়ে যাবে। নিশ্চয়ই দু'জন একসাথে আছেন।

আমি বললাম, মুহিব চাচার নম্বর তো জানি না।

ছোটো চাচা মুচকি হাসলেন। বললেন, নাহ! উপস্থিত বুদ্ধির ঘাটতি আছে দেখছি। তোমার বড়ো চাচার ফোনে মুহিব চাচার নম্বর নিশ্চয়ই সেভ করা আছে।

ও তাই তো...!

আমি বড়ো চাচার ফোনে সার্চ দিতেই মুহিব চাচার নম্বর বের হলো। ফোন করতেই মুহিব চাচা বললেন, তোমরা অপেক্ষা করে আছো। খুবই দুঃখিত...।

দুঃখিত হবার কারণ নেই কোনো। এতক্ষণ ছোটো চাচা আমাদের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা টিটুর কথা বলেছেন।

ছোটো চাচা বললেন, মানিকগঞ্জের টিটু। ও ছিল এক বেপরোয়া স্বাধীনতা পাগল কিশোর। আচ্ছা, আমরা মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।

মিনিট পনেরো পরে বড়ো চাচা আর মুহিব চাচা এলেন। তাদের কাছে অনেক খাবারের প্যাকেট। খাওয়ার পরে শুরু হলো কথা। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের কথা-

বড়ো চাচা শুরু করলেন, মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। বাঙালি হলেও পাকিস্তানিদের পছন্দের মানুষ। অক্টোবরের ১৩ তারিখ। সন্ধ্যায় মোনায়েম খান বসেছিল তার ড্রইং রুমে। কথা বলছিল কয়েকজন মেহমানের সাথে। তাদের মধ্যে ছিল প্রাক্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন, কয়েকজন মুসলিমলীগ নেতা, এবং মোনায়েম খানের জামাতা জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। ড্রইং রুমের সদর দরজা খোলা ছিল। মোনায়েম খান বসেছিল

দরজার দিকে মুখ করে। হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল দুই কিশোর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি। গুলি মোনায়েম খানের পেটে বিঁধে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। মোনায়েম খানকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ভোরের দিকে সে মারা যায়।

মোনায়েম খানের মৃত্যুতে ঢাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। ঢাকা শহরের সব মিষ্টির দোকানের মিষ্টি ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা অত্যাচারী লোকের ওপর মানুষের কতটা ঘৃণা থাকলে তার খুন হবার খবর শুনে খুশিতে উল্লসিত হয়ে মিষ্টি কিনে দোকান সাফ করতে পারে! মোনায়েম খান কে ছিল জানো? সে ছিল বাংলার এক কুসন্তান। আইয়ুব খানের আমলে গভর্নর হয়ে বাঙালিদের বুকের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল ছয়-সাত বছর। মানুষ শেষ পর্যন্ত অত্যাচার আর সহ্য করতে পারে না। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে। আইয়ুব খানের পতনের আগেই তার পতন হয়। তারপর সে চুপচাপ বাড়িতে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে। পাকিস্তানি অপশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে কিছু একটা করার ষড়যন্ত্র করছিল।

মোনায়েম খানকে যে গুলি করেছিল তার নাম মোজাম্মেল হক। সে তখন নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক কিশোর। আর তার সহযোগী ছিল আরেক কিশোর, যার নাম আনোয়ার হোসেন। কুমিল্লা সীমান্ত পার হয়ে মোজাম্মেল গিয়েছিল মেলাঘর ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চলে আসে ঢাকায়। মোজাম্মেলের চাচা আব্দুল জব্বার মোনায়েম খানের বাড়িতে কাজ করতেন। চাচার সঙ্গে মিলে সে পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। মোনায়েম খানের বাড়িতে আরো দুই কাজের লোক ছিল শাহজাহান ও মোখলেসুর রহমান। তারাও ওদের সহযোগী ছিল। অক্টোবর মাসে পরপর দুইবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। তৃতীয়বারে সফল। সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনাদের কড়া প্রহরা এড়িয়ে প্রাচীর টপকিয়ে বাড়িতে ঢোকে কিশোর মোজাম্মেল ও আনোয়ার হোসেন। এমন সাহসী এক অপারেশন সম্পন্ন করতে তারা সময় নিয়েছিল মাত্র চার মিনিট। মুক্তিযুদ্ধের এই অসম সাহসিকতার জন্য মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন।

মোজাম্মেল হক আর আনোয়ার হোসেনের শ্বাসরুদ্ধকর অপারেশনের কথা শুনে আমরা বাকরুদ্ধ।

সীমান্তে পাকিস্তানিদের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ বাড়তে থাকে বলে পাকিস্তান দোষারোপ করে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলা করছে। ১৮ই অক্টোবর তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর হামলা সম্পর্কিত পাকিস্তানের অভিযোগ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী নয়, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকায় তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। মুক্তিবাহিনীতে দেড় লাখ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। এদের প্রায় ৫০ লাখ পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্য। তারা সবাই বাঙালি এবং ২৫শে মার্চ রাতে এদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম আক্রমণ করার পর এরা প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়। তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে।

মুহিব চাচা পানি খেয়ে কণ্ঠ ভিজিয়ে নেন। তারপর বলেন, অক্টোবরের ২৬ তারিখে মুজিবনগর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিবেশনে সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশ প্রশ্নের সমাধানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐ ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশ প্রশ্নের একমাত্র সমাধান হচ্ছে 'জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা'। বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিশ্বের সব দেশ ও জাতিসংঘকে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করার আহ্বান জানায়। বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে উপনির্বাচন ঘোষণা দিয়ে ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। তার সমুচিত জবাব দেওয়ার শপথ নিয়ে এই পরিষদ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, নির্বাচন তো দূরের কথা, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে তথাকথিত পাকিস্তানিদের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বাঙালি জাতি ও আওয়ামী লীগ কিছুতেই সহ্য করবে না। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে গণহত্যা, পাশবিক অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে, পরিষদ বিশ্বমানবতার কাছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানায়।

মুহিব চাচার কথা শেষ হলো। বড়ো চাচা বললেন, আমরা তখন চূড়ান্ত স্বাধীনতা থেকে মাত্র আড়াই মাস পিছিয়ে। এসময় দালাল-রাজাকারদের অবস্থা হয়ে গেল খুবই করুণ। এতদিন তারা খান সেনাদের খেদমত করেছে। তাদের মন জুগিয়েছে। নানাবিধ

সুবিধা আদায় করেছে। এখন সেই প্রভুদের মুখ শুকনো। তা দেখে দালাল-রাজাকারদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। খান সেনারা তো সারেন্ডার করেও বাঁচতে পারবে। কিন্তু বাঙালি সেনা ও জনতা এগিয়ে আসছে পশু হত্যায়। তাদের অবস্থা কী হবে? মুক্তিসেনা তো তাদের পরিচিত ছেলেরা। ওরা কি তাদের ক্ষমা করবে?

শান্তি কমিটির অনেকেই তখন নিদারুণ অশান্তির ভয়ে বড়ো বেশি ভালো মানুষ হতে লাগল। প্রতিবেশী মানুষদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করতে লাগল। কারণ, প্রতিবেশীর সার্টিফিকেটের ওপরই তখন অনেকের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। রাজাকাররা বুঝে গেছে যে, 'এইসা দিন নেহী রহেগা'। যেখানে বড়ো বড়ো হাতি তলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তাদের ঠাঁই কোথায়? হানাদারদের কাছ থেকে ঢাকা দখলের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। ৩১শে অক্টোবর 'সানডে টাইমস' পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি জানান, আট শতাধিক গেরিলা সম্প্রতি ঢাকা শহরের কর্মব্যস্ত এলাকাগুলোতে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গেরিলাদের আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে বাধা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমানগুলোর ওঠানামার পদ্ধতিও বদলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত বোয়িং বিমানগুলো আলো জ্বেলে ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করত। কিন্তু এখন বিমানগুলো যথাসম্ভব বিনা আলোয় জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করছে।

চা পর্ব শেষে আমরা অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার অপেক্ষায়। মুহিব চাচা বললেন, আসলে ভুলটা হয়েছিল শুরুতেই।

আমরা ঝট করে তাকালাম মুহিব চাচার দিকে। কীসের ভুল, কার ভুল কিছু বুঝতে পারছিলাম না।

মুহিব চাচা বললেন, জিন্নাহর ধর্মের ভিত্তিতে অর্থাৎ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ছিল মারাত্মক ভুল। '৪৭ এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত আর পাকিস্তান নামক দু'টি দেশের জন্ম হলো। আমরা হলাম পাকিস্তানের অংশ। একই দেশ কিন্তু মাঝখানে ব্যবধান ১২শ' মাইল। ব্যবধান আরো অনেক কিছুতেই। একমাত্র ধর্ম ছাড়া মিল নেই আর কিছুতেই। ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি কিছুতেই নেই কোনো মিল। এরকম কোনো দেশ হয়?

অদ্ভুত এক দেশ। শুরু থেকেই পাকিস্তানিরা আমাদের ওপরে চালাতে লাগল নির্যাতনের স্টিমরোলার। সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের অর্থ ও সম্পদ লুটে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বানাতে লাগল রাস্তাঘাট, কলকারখানা। প্রতিবাদী হলেই আমাদের রক্তে লাল করেছে ওদের নিষ্ঠুর হাত। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে যেতে আমরা চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার জন্য রুখে দাঁড়াই। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। আর এই স্বাধীনতার পথে হাঁটতে আমরা পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন নির্ভিক দেশপ্রেমিক নেতা। এরকম নেতা ছাড়া একটি দেশ ও জাতির স্বাধীনতা অর্জনের পথ সহজ হয় না, সম্ভবও হয় না।

আমার বন্ধু রাশেদ দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের এই দেশ বিশেষ কোনো ধর্ম-বর্ণের মানুষের নয়। এই দেশ সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের। আমরা সবাই মানুষ। আমরা সবাই বাঙালি। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। ভালোবাসি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠলাম। ও ঠিক কথা বলেছে।

আমাদের গ্রাম

খায়রুল আলম রাজু

ফুল ফুটে অলি উড়ে আমাদের গাঁয়ে,
নদী ছুটে নিরবধি ডানে আর বায়ে।
পাখিদের গানে গানে নেমে আসে ভোর,
জেগে উঠে খোকাখুকি খোলে দিয়ে দোর।

খেয়াঘাট, ডিঙি নাও পানি থই থই
দুই পাড়ে ছেলে-মেয়ে করে হইচই।
দূর মাঠে শুনি রোজ রাখালের বাঁশি,
ক্ষেত ভরা ধান দেখে শালিকের হাসি।

জেলে ভাই মাছ ধরে জলে ফেলে জাল,
কিচিমিচি করে পাখি সকাল-বিকাল।
প্রকৃতির রূপ দেখে মন নেই পাঠে,
দিন শেষে লাল রবি চলে যায় পাটে।

একাদশ শ্রেণি, জনাব আলী কলেজ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

ছড়ায় ছড়ায় নীতিকথার জানা গল্প

কাঠুরিয়ার সততা

মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন

এক যে ছিল কাঠুরিয়া, থাকত অচিন গাঁয়,
কাঠ কেটে রোজ বেচত হাটে, অল্প ছিল আয়।
নদীর ধারে একদিন সে কাঠ কাটতে গেল,
কুঠার হঠাৎ পড়ল জলে, তার চোখে জল এল।

খানিক পরে নদী থেকে জলপরি এক এসে,
বলল তাকে, 'যাচ্ছ কেন চোখের জলে ভেসে?'
এটা শুনে কাঠুরিয়া চোখ মোছে আর বলে,
'শেষ সম্বল কুঠার আমার পড়ে গেছে জলে।'

জলপরিটা কাঠুরিয়ার দুখের কথা জেনে-
বলল তাকে, 'আর কেঁদো না! দিচ্ছি কুঠার এনে।'
এটা বলেই জলপরিটা ফের জলে ডুব দিয়ে,
আসল ফিরে খানিক পরেই সোনার কুঠার নিয়ে।
বলল, 'এ নাও তোমার কুঠার! খুশি তো নিশ্চয়?'

কাঠুরিয়া বলল, 'এটা আমার কুঠার নয়।'
জলপরিটা ডুব দিয়ে ফের রূপার কুঠার আনে,
এবং সেটা দেয় এগিয়ে কাঠুরিয়ার পানে।
কাঠুরিয়া বলল আবার, 'এটাও আমার নয়',
জলপরি তার কথা শুনে ভীষণ খুশি হয়।

মুগ্ধ হয়ে জলপরিটা তখনই ডুব দিয়ে,
আসলো ফিরে সোনা, রূপা, লোহার কুঠার নিয়ে।
আর বলল, 'মুগ্ধ আমি তোমার সততায়,
তিন কুঠারই তাই তো আমি দিলাম তোমার পায়!
খুশি মনে যাও বাড়িতে, কেঁদো না কো আর।
সততা যার মাঝে থাকে পায় সে পুরস্কার।'

মঙ্গলগ্রহে

নাসির ফরহাদ

নদীর মতো চলছি ছুটে অচিন পুরের দেশটায়,
ঢেউয়ের বেগে যায় হারিয়ে নীল আকাশের শেষটায়।
পথের কেয়া বনের পাশে হাসনাহেনার গাছটা,
অনুভবে টের পেয়েছে আমার যাওয়ার আঁচটা।

যাচ্ছি কোথায় হুস কি আছে? বেখেয়ালি মনটায়!
দুপুর গিয়ে রাত হয়েছে ঘড়ির দেওয়া ঘণ্টায়।
মেঘের নায়ে যাচ্ছি ভেসে মঙ্গলগ্রহের প্রান্তে,
মঙ্গলগ্রহে কি আছে ভাই গবেষণায় জানতে।

মঙ্গলগ্রহের মানুষ হতে আমার বড়োই ইচ্ছে,
কল্প আঁকা মনের মাঝে সেথায় হানা দিচ্ছে।
আজকে ফিরি কাল আসিব বাবা মায়ের সঙ্গে,
মঙ্গলগ্রহ পাড়ি দিব মজার কত ঢঙ্গে।

মা

আলিম রহমান

মায়ের স্নেহ মমতা
স্বর্গের চেয়েও স্নিগ্ধতা।
তোমার লালন পালনে
হয়েছি বড়ো, হবও
জীবনে শ্রেয় সব কিছু তাই
কয়েছি, চিরদিন কবও।
মায়ের হৃদয় সন্তান
মমতায় ভরে তোলে
সন্তানের মনে মা
ভালোবাসায় ওঠে দুলে।

১০ম শ্রেণি
ওহাব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

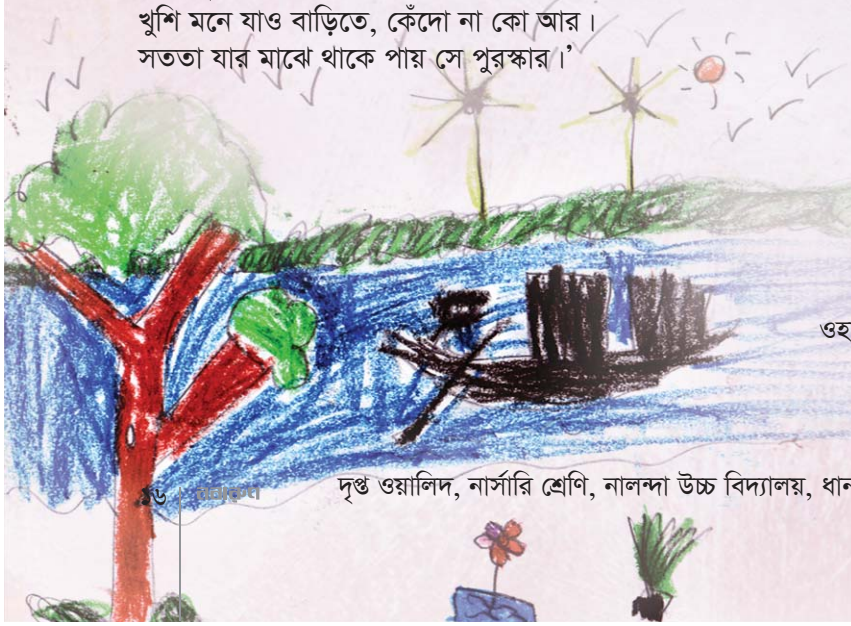

দৃপ্ত ওয়ালিদ, নার্সারি শ্রেণি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা

গল্প

রবির আলোয়

পুলক রাহা

রবি ভেবেছিল, রাকিব ওর বন্ধু। আসলে তা নয়। স্মার্ট হতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়ে গেল রবি!

সকালবেলা। রবি তার ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি করছে। একটু পরেই গাড়ি চলে আসবে। তাকে বেরুতে হবে। ঢাকা থেকে আজ অনেক দূরে যাবে। পানাম সিটিতে। সেখানে তাদের স্কুলের পিকনিক। কী মজাই হবে আজ সারাদিন।

রবির মা সকাল থেকে বিষয়টি দেখছে আর মনে মনে হাসছে, ছেলে আমার বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কথা রবির থেকে দুই বছরের বড়ো। এবার এসএসসি দিবে আর রবি নবম শ্রেণিতে। রবি কথার রুমের দিকে যায় আর জোরে জোরে ডাকতে থাকে, আপু! ও আপু! তোর সেন্টটা একটু দে না।

কথা রুমের দরজা ফাঁক করে রবিকে দেখে— মেয়েদের সেন্ট দিয়ে কী করবি?

দে না আপু -সেন্টের আবার মেয়ে-ছেলে।

কথা সেন্টটি ওর দিকে এগিয়ে দেয় আর বলে দেখিস এই সেন্ট গায়ে দিলে তোকে সবাই মেয়ে বলে খেপাবে। তখন কিন্তু আমাকে কিছু বলতে পারবি না। কিরে এত সাজুগুজু করে কোথায় যাচ্ছিস রে?

আমাদের পিকনিক— পানাম সিটিতে যাব। খুব মজা করব আজ। আজ আর কোনো পড়াশুনা নেই। স্যারের পড়া করার চাপ নেই। শুধু আনন্দ করব।

তোদের স্কুলের ছেলেমেয়ে সবাই যাবে।

হ্যাঁ যাবে।

কথা মিট মিট করে হাসতে হাসতে বলে ও বুঝেছি —তাই এত সাজগোজ।

আপা তুমি না—

যাও তোমার সাথে

কোনো কথা নেই!

বাড়ির সামনে রাস্তায় স্কুলের বাস চলে এসেছে। হর্ন বাজাচ্ছে। মা তাড়াতাড়ি রবির ব্যাগটাতে পানি আর বিস্কুটের প্যাকেট ঢুকিয়ে রবির কাছে দেয়। রবি বাসের দিকে দৌড় দেয়। মা পিছন থেকে বলেন সাবধানে যাস্ বেশি হুড়োহুড়ি করবি না। স্যারদের কথা শুনে চলবি। আর এই পানিটা খাবি। বাইরের কোনো পানি খাবি না। তোর তো আবার একটুতেই পেট খারাপ হয়ে যায়।

রবি স্কুলের বাসে উঠতেই সবাই হই হই করে উঠে। বাস চলতে শুরু করল। রাকিব আগে থেকেই রবির জন্য তার পাশের সিটটি রিজার্ভ করে রেখেছিল। রবি রাকিবের পাশে বসে। তার অন্য বন্ধুরা গান গাইছে। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা মনে মনে।' রাকিব জিজ্ঞাসা করে তোর ব্যাগে কিছু আছে নাকি। রবি খুবই সাধারণভাবে উত্তর দেয় পানি আর বিস্কুট আছে। ও শুধু পানি?

টিচার হ্যান্ড মাইকে বলছেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই মন দিয়ে শোনো, মোগল আমলের এই ঐতিহ্য-সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের, তোমরা ময়লা অবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলবে না- শিক্ষকের ঘোষণা উপচে ছেলেমেয়েদের হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ে।

বাসটি প্রথমে সোনারগাঁ জাদুঘরে থামে। সবাই নেমে জাদুঘরে চলে যায়।

রাকিব সিটে বসে থাকে।

রবি তাকে ডাক দেয়- কিরে তুই যাবি না।

আরে এখানে অনেকবার এসেছি— দেখার কিছু নেই। পানাম সিটিতে নিরিবিলি জায়গা আছে—

ওখানে মাস্তি করা যাবে- তাই তো এলাম। যা তোরা ঘুরে আয়। আমি এখানে আছি।

রবি মন খারাপ করে বাস থেকে নেমে পড়ে। একা একাই হাঁটতে থাকে। পাশ থেকে মেঘ, ওদের ক্লাসের ফার্স্টবয় রবিকে ডাক দেয়। চল আমরা একসাথে যাই। রবি আর মেঘ একসাথে সোনারগাঁ মিউজিয়াম ঘুরে ঘুরে দেখে।

সবাই হই হই করে আবার বাসে উঠে যে যার সিটে

বসে। শিক্ষক ঘোষণা দেন এখান থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে পানাম সিটি। সবাই নামার সময় দুপুরের খাবার প্যাকেট সাথে নিয়ে নামবে।

অবশেষে তাদের বাসটি পানাম সিটির সামনে একটা বিশাল বই-এর সামনে এসে থামল। এই বইটাতে পানাম সিটির ইতিহাস লেখা আছে। সবাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আবার কেউ কেউ বইটি পড়তে থাকে। যে যার বন্ধুদের দল নিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে পানাম সিটির বাড়িগুলো দেখতে যায়। সবাই মোবাইলে সেফলি আর ছবি তুলছে।

রাকিব, রবি, মেঘ, সুমনা, পলি, রাজিব দলবেধে বিশাল বিশাল পুরাতন বাড়ি থেকে ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন কারুকাজ থেকে বোঝার চেষ্টা করছে কখন এটা তৈরি হয়েছিল। কেনই বা এটা পরিত্যক্ত হলো।

হঠাৎ রাকিব বলে - এসব আর ভালো লাগছে না চল একটু নিরিবিলি জায়গায় যাই। একটু মজা করি। মেজাজ আসছে না।

ওরা সবাই একেবারে শেষের দিকের একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

রাকিব তার ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে। পলি তার ব্যাগ থেকে একটা দেশলাই বের করে। রাকিব সবাইকে একটা করে সিগারেট দেয়। মেঘ সিগারেট নেয় না, মেঘ রবিকে বলে চলে আয়। এটা মোটেও ভালো না।

রবি নেবে কি নেবে না ভাবতে থাকে। রাকিব বলে— আরে স্মার্ট হতে হলে সিগারেট খেতে হয়। আর মেয়েদের সামনে যেয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বি দেখবি মেয়েরা তোকে কেমন স্মার্টবয় ভাববে।

পলি আর রাকিব একটা করে সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

মেঘ বলে এটা তো সিগারেটের গন্ধ মনে হচ্ছে না।

রাকিব বলে, এটা একটা স্পেশাল সিগারেট... খেয়েই দেখ না- তখন বুঝবি মেজাজটাই পালটে যাবে। আলাদা ভাব আসবে। পৃথিবীটা কত রঙিন মনে হবে। রবির হাতে সিগারেট। ধরাবে কি ধরাবে না বুঝতে পারছে না।

মেঘ, সুমনা, রাজিব এখান থেকে চলে যায়।

রবিকে স্মার্ট হতেই হবে। না হলে তো পিংকি ওকে

পচ্ছন্দ করবে না। পলি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে রবির সামনে ধরে। রবি সিগারেটটা মুখে নেয়। পলি ওর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। রবি সিগারেটে একটা টান মারে। মাথা টা ঘুরে যায়। রবি নিজেকে আর স্মার্ট রাখতে পারে না। সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আর কিছুই মনে করতে পারল না।

পড়ন্ত বিকেল।

সূর্যটা পানাম সিটির পলেস্তারা খসে পড়া ইমারতের ফাঁক গলে রবির মুখে এসে পড়েছে। জ্ঞান ফিরেছে রবির।

রবি চোখ খোলে। আস্তে আস্তে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। ও এখানে এভাবে শুয়ে আছে কেন। তার দিকে উৎসুক চোখগুলো দেখতে পায় পলি, মেঘ, পিংকি, সিয়াম- আরো সবাই। ও প্রচণ্ড লজ্জা পেয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে। তার ক্লাস টিচার ঘাড়ে হাত দিয়ে উঠে বসতে সাহায্য করেন।

বাস চলছে। মেঘের পাশের সিটে বসে আছে রবি। বাসের জানালা দিয়ে দেখছে - এক এক করে বাড়িঘর সরে সরে যাচ্ছে। পড়ন্ত বিকেলের সূর্যটা ওর জানালার পাশে পাশে ছুটছে ওকে ছাড়তে চাইছে না। সূর্যের লাল আভা ওর আর মেঘের মুখে পড়ে একটা অদ্ভুত আভা তৈরি করেছে। লজ্জায় মেঘের দিকে তাকাতে পারছে না।

মেঘ ওর ঘাড়ে হাত রাখে। আস্তে আস্তে বলে স্মার্ট হতে নেশা করা লাগে না। নিজের ভিতরের যে শক্তি আছে তাকে জাগাতে পারলেই স্মার্ট হতে পারবি।

বাসের সাউন্ড বক্সে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে– আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজেরে কর জয়...

রবি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ...চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওর ভয় হচ্ছে সবাই কি ওকে এভাবে ছেড়ে চলে যাবে। বাড়িতে সবাই যদি জানতে পারে তাহলে কী হবে ...নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ...হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রবি।

পিংকি আর স্যার তার পাশে আসে। স্যার তার মাথায় হাত দেয়। স্যারকে জড়িয়ে ধরে। নিজের ভুল যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে ও পথে আর পা বাড়িও না। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে পারোনি। তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে কিছু করার আগে যুক্তি দিয়ে ভাবা উচিত ছিল। আর এ রকম পরিস্থিতিতে না বলতে হয়।

পাশে দাঁড়ানো পিংকি বলে তোমার মতো ভালো মেধাবী ছেলেরা এটা করবে আমরা ভাবতেও পারিনি। তুমি তো আমাদের সকলের ভালো বন্ধু। আমরা সবাই তোমার পাশে আছি।

একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে রবি। চোখের জল মুছে। এবার বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। চারপাশের আলোগুলো তারার মতো ওকে জড়িয়ে রেখেছে। গাড়ি ছুটছে ...হাওয়ায় রবির চুল যেন উড়ছে... রবীন্দ্রনাথের গান... আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজেরে করো জয় ...সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে করো জয়।

রুম্পার দিনগুলো

রিমা লিমা

রুম্পা ভেবেছিল, মা মোটেও ভালো না। একসময় ঠিকই বুঝল, মায়ের কথা না শুনলে বিপদে পড়তে হতো!

রুম্পা স্কুল থেকে ফিরে স্নান সেরে বের হতেই মা'র কর্কশ চিৎকার শুনতে পেল 'এখানে আসো জলদি, তোমাকে আর কত বলব যে স্কুলের ড্রেস এভাবে খুলে রাখবে না। একটা কথাও তুমি ঠিকমতো মেনে চলো না।'

রুম্পা ভেবেই পায় না মা কেন এত পচা করে কথা বলে? সুন্দর করে বললেই তো হয়। যাই হোক ভাত খেতে খেতে টিভি দেখা রুম্পার ভারি পছন্দ। আবার মা'র বকুনি... কি ব্যাপার ভাত নিয়ে ডাইনিং টেবিলে যাও এসব কি! উফফ মা যে কেন সবসময় এমন করে! রুম্পার আর ভাত খেতেই ইচ্ছে করল না।

রুম্পা পাশের রুমে ছোটো ভাই কী করছে দেখতে গেল। রুম্পার ভাই রিঙ্কু খুব মজার। আজ সে তার টেবিলে বসে ড্রয়িং করছে। কী আঁকছে দেখতে এসেই রুম্পার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চিৎকার করে মাকে ডাকল বলার জন্য যে রিঙ্কু তার খাতায় ছবি আঁকছে! মা রিঙ্কুকে বকা না দিয়ে বরং রুম্পাকেই ধমক দিয়ে দিল। রিঙ্কুও এত দুষ্টু যে শুধু শুধু কান্না জুড়ে দিল। ধ্যাত! বাসার কাউকেই রুম্পার আর ভালো লাগে না। কেউ রুম্পাকে বুঝতেই পারে না।

রুম্পার খুব ভালো বন্ধু শ্রেয়সী। মা ঘুমিয়েছেন তাই এই সুযোগে রুম্পা ভাবল শ্রেয়সীর সাথে কথা বলবে। মা জেগে থাকলেই বলবে ... 'এত কী কথা ক্লাসে তো দেখা হয় প্রতিদিন'। আজ এই সুযোগে রুম্পা প্রায় ৩০ মিনিট কথা বলে ফেলল। ক্লাস টিচার এত কড়া যে ক্লাসে কোনো কথা বললেই উনি রেগে যান নয়ত প্রথম সারিতে একা বসিয়ে দেন।

আজ ক্লাসে একটা মজার কাণ্ড হয়েছে ... সিয়াম পানি খাচ্ছিল হঠাৎ কাশি লেগে সে পানি ফেলে দেয় সউমিকের শরীরে। আর সউমিকটাও কথায় কথায় কাঁদা তার স্বভাব! ক্লাসে সবাই আজ সউমিকের কাণ্ড দেখে খুব হেসেছে। শুধু এটা কেন, ক্লাসে ওর বোকা বোকা প্রশ্ন শুনেও শিক্ষিকা সহ সবাই মজা পায়।

সউমিকও রুম্পার একজন ভালো বন্ধু।

আজ ক্লাসে বিজ্ঞান বইয়ের একটা অধ্যায় পড়েছে ওরা। উফফ কি যে ফানি করে লিখা। ফুল প্রজনন অধ্যায়ের শিরোনাম লিখা ছিল 'সেক্সি ফ্লাওয়ার'

ক্লাসের কিছু ছেলে খুব দুষ্টু। ওরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অকারণে হাসাহাসি করে। রুম্পা ছেলেদের এই দলটাকে একদম পছন্দ করে না। শ্রেণি শিক্ষকের কাছেও ওরা অনেক বকা খায়। ওদের কাজই হলো শুধু শুধু ক্লাসে গন্ডগোল করা।

সন্ধ্যায় কিছুতেই আজ পড়তে ভালো লাগছে না রুম্পার। না... এখন যদি মাকে বলি মা খুব বকবেন। তাই টেবিলে বসে শুধু শুধু খাতায় আঁকাআঁকি করছিল।

অথচ রিঙ্কু এখনো ওর ট্যাব নিয়ে খেলছে মার পাশে বসে। মা ওকে কিছুই বলে না। মাকে কিছু বললেই বলবে রিঙ্কু ছোটো তুমি বড়ো হয়ে গেছ।

এই বড়ো হওয়াটা রুম্পার ভালো লাগে না। আগে মার খুব কাছে ঘেঁষে ঘুমাত। এখন তো রিঙ্কুর জন্য মার কাছেই যাওয়া যায় না। আর মাও কেমন আর আগের মতো ভালোবাসেন না। সবসময় এটা করো ওটা করো না এত শাসন এত নিয়ম রুম্পার ভালো লাগে না। ক্লাসের কয়েকজন মিলে ঠিক করেছে ওরা শুক্রবারে শ্রেয়সীদের বাসায় সারাদিন থাকবে। শ্রেয়সী অনেক স্বাধীন ওর যা খুশি ও করতে পারে। শ্রেয়সীর মা চাকরি করেন তিনি মাঝে মাঝে অফিসের কাজে দেশের বাইরে যান। এখন তিনি বাসায় নাই। কিন্তু রুম্পা জানে যদি মাকে বলে ও শ্রেয়সীর বাসায় সারাদিন থাকবে কখনোই রাজি হবেন না। অথচ সাথি, ববি, মৌ, সউমিক সবাই যাবে ঠিক করেছে। এটা ভেবে রুম্পার মনটা খুব খারাপ। ভাবছিল কেন যে ওর মা শ্রেয়সীর মার মতো হলো না।

রুম্পার আজ স্কুল হতে ফেরার পথে ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজেছে। বৃষ্টি তার খুব প্রিয়। বাসায় ফিরেই তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে যায় মা বুঝে ফেলার আগেই। উফফ বড্ড বাঁচা গেল। আজ বৃষ্টিতে ভিজে রুম্পার মনটা খুব ভালো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলেই হয়। যদি জ্বর হয় মা ঠিক বুঝে ফেলবে।

রুম্পার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি অসুখ হতো তো বেশ হয়! স্কুলে যেতে হবে না। সারাদিন টিভি দেখা যাবে, গল্পের বই পড়া যাবে। শ্রেয়সী একটা নতুন বই কিনেছে বইটাতে সব ভয়ংকর ভূতের গল্প আছে। কবে যে বইটা পড়তে পারবে। রুম্পা ঠিক করল আজ ফোনে বলবে যেন শ্রেয়সী কাল বইটা নিয়ে আসে স্কুলে। আজ ও খুব সুন্দর একটা নোটবুক বানাবে যেখানে ওর পছন্দের ব্যান্ড কেপপ আর বি টি এস-এর ছবি আর গান লিখে রাখবে। খুব সুন্দর ছবি আঁকবে কভার পেজে। নোট বুক বানাতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। তবে রুম্পা খুব খুশি। রুম্পাকে বাবা ব্যান্ড দলের সবার ছবি এনে দিয়েছিল। রুম্পা ছবিগুলো খুব যত্ন নিয়ে পেস্ট করল। কাল যখন স্কুলে দেখাবে ওর বন্ধুরা সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবে।

পরেরদিন স্কুল থেকে ফেরার পরই মা বললেন আজ সন্ধ্যায় রফিক আংকেলরা আসবেন। তাই যেন ভালোভাবে নিজের রুম গুছিয়ে রাখি। মা স্নান করে ভালো জামাও পড়তে বললেন।

রফিক আংকেলকে রুম্পার একটুও পছন্দ নয়। তিনি যখন আসেন সবসময় অনেক গিফট আনেন রুম্পা আর রিঙ্কুর জন্য, অনেক মজার গল্প করেন ; তবুও রুম্পার ভালো লাগে না। ইদানীং তিনি শুধু শুধু রুম্পার পিঠে হাত দেন, না হয় পাশে বসে কোমরে হাত রাখেন। কাজটা মা বাবার সামনেই করেন। রুম্পার এত অস্বস্তি হয়। কিন্তু কেউ বোঝে না। মাকে একদিন বলেছিলাম, মা তো বুঝলই না বরং বকা দিয়ে বলল 'তোমাকে এত আদর করে আর তুমি পছন্দ করো না কেন? তিনি তোমাকে তার মেয়ের মতো স্নেহ করেন।'

রুম্পা ঠিক করল আজ সে আংকেলের সামনেই যাবে না। আর কাল ওর ক্লাস টেস্ট তাই মাকে বলে দিল মা আমাকে অনেক পড়তে হবে। আমি আমার রুমেই থাকব।

সন্ধ্যায় রুম্পা খুব মনোযোগী হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করল কেউ একজন পিছন থেকে ওর পিঠে হাত দিয়েছে। রুম্পা ভয়ে, রাগে হতবিহবল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই হাতে থাকা পেন্সিল দিয়ে জোরে আঘাত করল হাতটিতে সঙ্গে সঙ্গে আংকেল ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। আংকেল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল তখন। এদিকে আংকেলের চিৎকার শুনে মা চলে এলেন কি বিষয় জানতে। আংকেল দিব্বি হাসিমুখে বলে দিলেন রুম্পাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।

ওইদিন খাবার টেবিলে বা বসার ঘরে কোথাও আংকেল আর রুম্পার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। রুম্পা দুষ্টু আংকেলকে শাস্তি দিতে পেরে খুব খুশি। এখনই ফোন করে শ্রেয়সীকে সবটা জানিয়ে দিতে পারলে বেশ মজা হতো।

রাতে শুয়ে রুম্পা বিষয়টি ভাবছিল। রুম্পার শারীরিক পরিবর্তন হবার পর হতেই সবাই কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকে দেখে। বিশেষ করে রাস্তায় বের হলে আশপাশের লোকজনরা কি অদ্ভুতভাবে তাকায়। মা বলেই দিয়েছে রাস্তায় খুব চোখ কান খোলা রেখে চলতে; কারণ রাস্তায় অনেক দুষ্টু লোক থাকে যারা সুযোগ পেলেই গায়ে হাত দিতে চায়! রুম্পা ঠিক করেছে ও ক্যারাটে শিখবে আর এ ধরনের দুষ্টুদের শায়েস্তা করবে।

রুম্পার ছাদে যেতে খুব ভালো লাগে। ছাদ থেকে উড়ে যাওয়া পাখিদের গুণতে খুব মজা লাগে। এই তো গত বছরও রুম্পা রিঙ্কু আর মিলে ছাদে ঘুড়ি উড়িয়েছে! গ্রেড সিক্সে উঠার পর থেকেই শুধু তুমি বড়ো হয়ে গেছ এটা করবে ওটা নয় কত যে নিয়ম! মা এখন আর ছাদে যেতে দেয় না! মা তো বারান্দায় দাঁড়ালেও বলবে 'রুম্পা ঘরে আসো সবাই তোমাকে দেখছে।'

রুম্পা ভেবেই পায় না কেউ যদি দেখে তো কী হয়; আমি তো দেখছি না। মা যে কেন এত্ত সেকেলে বুঝতেই পারে না। রুম্পার খুব ভালো লাগে যখন বাবা বাসায় থাকে। রুম্পার বাবা অফিসের কাজে পুরো সপ্তাহ ঢাকার বাইরে থাকেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে চলে আসেন। আবার রবিবার ভোরে চলে যান। বাবার সাথে গল্প করতে রুম্পার খুব ভালো লাগে। বাবা মার মতো নয়। বাবা এলেই বাইরে ঘুরতে যাওয়া হয় বাইরে খেতে যাওয়া হয়। বাবা বলেছে এইবার ভালো রেজাল্ট করলে যা চাইব তাই দিবে!

রুম্পার একটা সিক্রেট ডাইরি আছে যেখানে মাঝে মাঝে রুম্পা কবিতা লিখে, গল্প লিখে আর ওর স্বপ্ন লিখে রাখে। আজ ক্লাসের মাঝে জয়িতার পিরিয়ড (ঋতুস্রাব) হয়ে জামায় লেগে গিয়েছিল। ক্লাসের সবাই বিশেষ করে ছেলেরা হাসছিল। জয়িতা লজ্জায় প্রায় কেঁদেই দেয় এমন অবস্থা। রুম্পার এই বিষয়টা খুব অদ্ভুত আর বিশ্রি লাগে কেন যে প্রতি মাসে এসব হয়। ছেলেদের তো হয় না। প্রতি মাসে পাঁচদিন পেটে ব্যথা, বুকে ব্যথা তারপর ছয় ঘণ্টা পর পর প্যাড পালটানো! এত ঝামেলা!

মা বলেছে এমন নাকি অনেকদিন হবে প্রায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। রুম্পা ক্যালেন্ডারে প্রতি মাসে দাগ কেটে রাখে পরের মাসের পিরিয়ডের দিন বোঝার জন্য। এই সময় মা বেশি বেশি খেতে বলেন। সকালে দুধ ডিম খেতে রুম্পার ভালো লাগে না কিন্তু মা পিরিয়ডের সময় জোর করেই খাইয়ে দেন।

মা বাবা দুজনই চান রুম্পা যেন বড়ো হয়ে ডাক্তার বা বাবার মতো প্রকৌশলি হয়। কিন্তু রুম্পার সায়েন্স পড়তে একটুও ভালো লাগে না। রুম্পা বড়ো হয়ে ইতিহাস পড়তে চায়। মাটির নীচের সব অজানা ঐতিহাসিক জিনিস আবিষ্কার করতে চায়। রুম্পা খুব সাহসী ও পরোপকারী হিসেবে ক্লাসে পরিচিত। ক্লাসে কেউ যদি কোনো বিষয় না বুঝে রুম্পা সবসময় সাহায্য করতে চায়। স্কুলের যে-কোনো অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। কেউ অসুস্থতার জন্য স্কুলে না আসতে পারলে তাদেরকে শ্রেণি কাজের খাতা দেখায়, পড়া বুঝিয়ে দেয়। তাই রুম্পা ক্লাসে অনেক জনপ্রিয়। এই বছর রুম্পা ক্লাস লিডার হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছে। এতে রুম্পার দায়িত্বও অনেক। সে প্রতিদিন একটু আগে

স্কুলে যায়। সবার বাড়ির কাজের খাতা গুছিয়ে শিক্ষিকাকে দেয়। রুম্পাদের ক্লাসরুমটা বেশ পরিছন্ন। রুম্পা স্কুলের দেয়ালে, বসার চেয়ারে বা টেবিলে আঁকা পছন্দ করে না আর বন্ধুদের কেও বুঝিয়েছে যে এটা ঠিক নয়।

কাল শ্রেয়সীর জন্মদিন। রুম্পা যাবে বলে ঠিক করল। মা বন্ধুদের জন্মদিনে যেতে দেয় কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যান। আবার অনুষ্ঠান শেষ হলে নিয়ে আসেন। কিন্তু রিঙ্কুর দুপুর থেকে হঠাৎ জ্বর হওয়ায় মা বললেন 'রুম্পা মন খারাপ করো না আমরা অন্য একদিন যাব।'

রুম্পার খুব মন খারাপ... ভেবে কেন যে আজই রিঙ্কুর জ্বর হলো! রিঙ্কুকে দেখেও খুব মায়া লাগছে। রিঙ্কু অসুস্থ হলে কিছুই খেতে চায় না। বাবা কাছে না থাকাতে মাও খুব চিন্তিত। আজ একটুও পড়ায় মন বসাতে পারল না। শুধুই মনে হতে লাগল বন্ধুরা এখন কত মজা করছে... কেক কাটছে... গান গাইছে। আর শ্রেয়সীর মা-বাবা প্রতিবারই শ্রেয়সীকে অবাক করে দেওয়ার জন্য নতুন কিছু করেন। এবারও নিশ্চয় তেমন কিছু থাকবে।

রাতে রুম্পা না খেয়েই ঘুমিয়ে গেল। পরেরদিন স্কুলে গিয়ে রুম্পা অবাক। শ্রেয়সী, পলা, ববি, রুপম,জয়িতা কেউ আসেনি। সউমিকও খুব মন খারাপ করে এক দিকে বসে আছে। সউমিকের কাছে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কথা জানতে চাইলেও কিছু বলছিল না! কিছুক্ষণ পর প্রধান শিক্ষিকার রুমে সউমিকের ডাক পরল। সউমিক অফিস রুম থেকে এসে কিছুই না বলে সারা ক্লাস মাথা নিচু করে বসে রইল। রুম্পা কিছুই বুঝতে পারল না।

বাসায় ফিরে তাড়াতাড়ি স্নান করে খাবার খেয়ে নিয়েই শ্রেয়সীকে ফোন করল কী হয়েছে জানতে। শ্রেয়সীর কাছে সব শুনে রুম্পার ওর বন্ধুদের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। শ্রেয়সীটাও এত বোকা হয়েছে এমন কেউ করে! গতকাল নাকি সব বন্ধুরা আসার পর শ্রেয়সী মার অনুমতি নিয়ে সবাই মিলে গাড়ি করে এলোমেলো ঘুরতে বেরিয়েছিল। রাস্তায় খুব জোরে কেপপ (কোরিয়ান ব্যান্ড) মিউজিক শুনতে শুনতে ওরা গাড়িতে বসেই নাচছিল। এক পর্যায়ে জয়িতা আর ববি মিলে রাস্তার পথচারীদেরকে উদ্দেশ্য করে আজেবাজে মন্তব্য করেছে...। তাদের পোশাক, চেহারা নিয়ে বাজে কথা বলেছে। আর এটা কেউ একজন ভিডিও করে ইন্টারনেটে দিয়েছে যেটা এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ছি খুব খারাপ কাজ হয়েছে। রুম্পা ভাবল ও থাকলে এমনটা হতে দিত না। রুম্পার বন্ধুরা সবাই মা-বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছে। স্কুল থেকে সবার বাসায় ওয়ার্নিং লেটার দেওয়া হয়েছে!

রুম্পা রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মা যে এত নিয়মের কথা বলেন রুম্পাকে অনেক শাসন করেন সবই তো ওর ভালোর জন্য। কিছুক্ষণ পর মায়ের পায়ের আওয়াজ পেয়ে রুম্পা চোখ বন্ধ করে রইল। মা পরম যত্নে রুম্পার গায়ে চাদর দিয়ে দিল। তারপর লাইট বন্ধ করে কপালে চুমু দিল। রুম্পা এই সুযোগে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল মা তুমি অনেক ভালো। মা পরম স্নেহে আদর করে দিলেন। মার গায়ে কী যে সুন্দর একটা গন্ধ আছে। রুম্পার খুব ভালো লাগে। রুম্পা ঠিক করেছে ও কোনোদিন মা-বাবাকে কষ্ট দিবে না।

জাতির পিতা

মৃদুল ইসলাম

হে জাতির পিতা তোমাকেই মনে পড়ে
মনে পড়ে প্রতিটি ক্ষণে
তুমি নেই বিশ্বাস হয় না।
মানতে চায় না মন
তোমার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের ভাষণ
শুনতে ইচ্ছে হয় সারাক্ষণ।

পিতা তুমিই আমাদের স্বাধীনতা
আমাদের আত্মমহিমার বিশ্বাস
বাংলার মাটি তোমাকে নিয়ে
ছাড়ে গর্বের নিশ্বাস।

নবম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল, মান্ডা, ঢাকা

কমিক্স

লেখা ও আঁকা
কাজী তাবাসসুম আহমেদ

বন্ধু

রমজান আলী রনি

বন্ধু আমার সকাল-দুপুর
অবুঝ মনের চাওয়া
প্রাণে বাজে খুশির নূপুর
প্রবাল দ্বীপের হাওয়া!

চোখের তারায় স্বপ্ন নিয়ে
বন্ধু থাকে পাশে
গোপন ব্যথা ছুটি দিয়ে
মনটা আমার হাসে!

পাহাড়-নদী ঝরনাধারা
বন্ধুর প্রেমে গলে
নদীর স্রোতের গোপনধারা
সে-ও বন্ধুর দলে।
আমি ও আমার বন্ধু স্মার্ট, সচেতন।
আমরা মাদক থেকে সাবধান থাকি।
যে মাদক গ্রহণ করতে বলে, তাকে
কখনোই বন্ধু ভাবি না।

বিপদ হলে বন্ধু যদি
একটু পাশে থাকে
ভুলি সকল বিষের নদী
দুঃখ-কষ্টটাকে!

মো. তোফাজ্জল হোসেন, দ্বাদশ শ্রেণি, অ্যাডভান্সড রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ময়মনসিংহ

**আমি ও আমার বন্ধু স্মার্ট, সচেতন।
আমরা মাদক থেকে সাবধান থাকি।
যে মাদক গ্রহণ করতে বলে, তাকে
কখনোই বন্ধু ভাবি না।**

শুরুটা হয়েছিল ২০০৫-এ। নিজ পরিবারের গণ্ডি পার হয়ে যাওয়া শুরু করেছি স্কুলে। রোজ ক্লাসে যাওয়া-আসা প্রধান দায়িত্ব। ক্লাসে অন্যদের চেয়ে আমার আকর্ষণ কাড়ে অনিক নামের একজন। নাদুসনুদুস টাইপের ছেলে ছিল। একসাথে একই বেঞ্চে বসাই ছিল স্কুলে আমাদের প্রথম কাজ। সময়ের প্রবাহে আমাদের ভেতর যেন অন্য আরো একটি আকর্ষণ বল কাজ করে যাচ্ছে। ধারণা করি নিউটনের তত্ত্ব-ও এখানে তুচ্ছ অতি। যে-কোনো কাজের সঙ্গী হিসেবে ওর নামটাই আগে আসতো। আবিষ্কার করি বন্ধুত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা। আমরা একই স্কুলে স্থায়ী হলাম না বেশিদিন। আলাদা হলাম ভৌগোলিক দূরত্বে। যোগাযোগও নেই তখন আর। এরপর একদিনের ঘটনায় রীতিমতো অবাক বনে গিয়েছি। স্কুলের বারান্দায় যেতেই সেই অনিক। আলাদা এক অনুভূতি তখন। আবার একসাথে, একই ক্লাসের একই বেঞ্চে শুরু হলো জীবন। এ আনন্দ লেখার না, বলার না।

রাহাত রাব্বানী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

আমরা দুজন লেখাপড়ায় একই রকম, আমার রোল ৮ আর ওর ১১। ও খুব ভালো খুব সুন্দর কথা বলে, গল্প করে, শেয়ার করে। আমি ও ওর সাথে সব কিছু শেয়ার করি। আসলে প্রতিটা মানুষের একটা ভালো বন্ধু সেরা বন্ধু থাকা দরকার আর সেই বন্ধুই হলো অর্পি। আমি স্কুলে না গেলেও আম্মুর মোবাইলে কল করে পড়ার কথা বলে, আমিও তাই করি। আম্মু বলে সবার সাথে মিশতে, আমরা চেষ্টা করি, তবে ওর সাথেই বেশি বন্ধুত্ব। ২/৩ দিন দুজনের দেখা না হলে দুজনেরই খুব খারাপ লাগে। স্কুলে একসাথে খেলা করা, টিফিন খাওয়া সবই হয়। একসাথে গার্লস গাইডে যাওয়া, ক্যাম্পিং করা, অর্পি না থাকলে কিছুই যেন ভালো লাগত না। ২৯শে জুলাই ২০১৮ আমরা একসাথে গণভবনে যাই,প্রধানমন্ত্রী গার্লস গাইড ভবন উদ্‌বোধন করেন।

আমার প্রিয় বন্ধুর নাম ইসরাত ফারাবী অর্পি। ১১ বছর চলছে আমাদের বন্ধুত্বের। একই সাথে ফার্মগেট সেন্ট্রালরেটো টিউটোরিয়াল স্কুলে প্লে ক্লাসে ভর্তি হই আমরা। পরে একসাথে বটমলী হোমস গালর্স উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই, এবার আমরা ৮ম শ্রেণিতে পড়ি। অর্পি যে-কেনো আমার এত ভালো বন্ধু হয়েছে, প্রিয় বন্ধু হয়েছে তা খুঁজেই পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা দুজনেই পাগল আর এই পাগলামির জন্যেই দুজন দুজনের সেরা বন্ধু। মারামারিও কম করি না, দুজনের দুই হাতে অনেক চিমটি খামচির দাগ আছে। তবুও অর্পি আর আমি সেরা বন্ধু। অর্পি স্কুলে না আসলে আমার একেবারেই ভালো লাগে না। আবার আমি না গেলে ওর ভালো লাগে না।

অভ্র ফারিহা, ৮ম শ্রেণি, বটমলী হোমস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফার্মগেট, ঢাকা

নিবন্ধ

বন্ধু চিনে বন্ধু করো

শাহানা আফরোজ

আজকের শিশু আগামী দিনের পরিণত মানুষ। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ে আগামীর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে আজকের শিশুরাই। বাবা-মা'র আদরের সন্তান হলেও শিশুরা রাষ্ট্রের সম্পদ। এই সম্পদকে আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান শিশুবান্ধব সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যেই প্রণয়ন করেছে শিশুশ্রম নীতি-২০১৩। জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ সহ আরো অনেক কার্যক্রম- যার পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই। শিশুদের সকল অধিকার নিশ্চিত করে শিক্ষিত আদর্শ দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে বর্তমান সরকার প্রতিবছর ৭ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো পালন করে বিশ্ব শিশু দিবস। এ বছর শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য 'গড়তে শিশুর ভবিষ্যৎ স্কুল হবে নিরাপদ'। শিশু দিবসের পাশাপাশি পালন করা হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু। আর স্কুল হলো শিশুদের শিক্ষার মূল ভিত্তি। এদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শিশু দিবস পালনের পাশাপাশি স্কুলভিত্তিক নানা পরিকল্পনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

আইন প্রণয়নসহ বিনামূল্যে বই বিতরণ, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি শিশুরা যাতে বিপথে না যায় সেদিকেও লক্ষ রাখছে সরকার। সম্প্রতি বর্তমান সরকার স্কুলের সকল কার্যক্রমের সাথে আরেকটি বিষয় যোগ করেছে তা হলো মাদক বিরোধী কর্ম পরিকল্পনা। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম পিরিয়ডে তিন থেকে পাঁচ মিনিট হবে মাদক বিরোধী বক্তব্য। মাদক বিরোধী কমিটি থাকবে। কমিটি প্রতি মাসে একবার সভা করবে এবং মাসে দুইবার ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করবে। শিশুরা স্কুল থেকে যা শুনে বা বুঝে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে। আর তাই তো মাদক বিরোধী প্রচারণা স্কুল থেকে শুরু করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মাদক হলো এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য যা গ্রহণ করলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব পড়ে এবং আসক্তি সৃষ্টি করে। আমরা ভালোমন্দ বুঝতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয় চেতনাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেয়। চারপাশে সব নেতিবাচক হয়ে পরে। বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে– ধূমপান, হিরোইন, কোকেন, ইয়াবা, আফিম, গাঁজা, বিয়ার, কেটামিন, স্পিডসহ আরো বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ওষুধ। এ বিষয়ে নবারুণকে বিস্তারিত জানিয়েছেন মাদকাসক্তি ও পারিবারিক কাউন্সেলিং বিশেষজ্ঞ ড. কামরুন মুস্তাফা। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, নানা কারণে সব বয়সের মানুষ মাদক গ্রহণ করে। তবে কিশোর-কিশোরীরা তাদের আধুনিকতা, স্মার্টনেস, দেখানোর জন্যই মূলত মাদকের নেশায় আসক্ত হয়। অনেক সময় বন্ধুমহলের আনন্দের ভাগীদার হয়ে অনেকে মাদক গ্রহণ শুরু করে পরে আর সেই পথ থেকে ফিরে আসতে পারে না। আবার কেউ কেউ পরিবারের সমস্যা বা মা-বাবাকে ভুল বুঝে নিজেকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দেয়। যা পরবর্তীতে মাদক গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। আবার অনেকে মাদককে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করে এবং নেশায় পরিণত হয়। আবার আজকাল অনেকেই সফট ড্রিংস-এর বদলে এনার্জি ড্রিংকস গ্রহণ করে যা মাদকের প্রাথমিক পর্যায় বলে ধরা হয়। এভাবেই বুঝে বা না বুঝে অনেকে নানারকম মাদক গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

ড. কামরুন মুস্তাফা

আমাদের দেশে অনেক কাউন্সিলর আছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ড. কামরুন মুস্তাফা।

১৭ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাদকাসক্তি/ পারিবারিক কাউন্সিলিং বিশেষজ্ঞ ড. মুস্তাফা। যুক্তরাষ্ট্রের সার্দান ইলিনয় ইউনিভার্সিটি কার্বনডেল থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর সাত বছর একই বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি রেজিস্টার্ড অ্যালকোহল ড্রাগ ও ফ্যামিলি কাউন্সিলিং-এ বিশেষজ্ঞ এবং সার্টিফায়েড হেলথ এডুকেশন স্পেশালিস্ট।

মাদক গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নামক নিউরো ট্রান্সমিটার বৃদ্ধি পায়। যা সাময়িকভাবে ব্যক্তিকে আনন্দ দেয় বা হতাশা থেকে দূরে রাখে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মাদক আমাদের শরীরে অনেক ক্ষতি করে। শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নাই যার ওপর মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। ধীরে ধীরে এগুলো এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে ঔষধেও ভালো হয় না বরং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

মাদক নিতে শুরু করলে প্রাথমিকভাবে ক্ষুধা কমে যায়, মিষ্টি জাতীয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে। মিষ্টি বেশি খাওয়া এবং নিজের প্রতি খেয়াল না রাখার কারণে দাঁত নষ্ট হতে থাকে, রক্তচাপ বেড়ে যায়, মস্তিষ্ক তার কর্মক্ষমতা হারায় যার কারণে কী করবে বা করতে হবে বুঝতে পারে না। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় কখনো বা নষ্টও হয়ে যায়। জন্ডিস বা হেপাটাইসিস-এ আক্রান্ত হয়ে লিভার নষ্ট হয়। পানি কম খাওয়ার কারণে কিডনি তার কার্যক্ষমতা হারায়। অপরিচ্ছন্নতার জন্য ত্বকে নানা ধরনের খোসপাঁচড়া হয়। সবসময় মুখ ও নাক শুকিয়ে থাকে। বমি বমি ভাব লাগে সহ আরো অনেক অনেক কিছু।

মাদক গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় বুঝা না গেলেও আচরণগত ও শারিরীক পরিবর্তন দেখা যায় যেমন: চোখ লাল হওয়া বা চোখের মণি অস্বাভাবিক হওয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা, চেহারা ও পোশাকের অযত্ন, আঘাত পেলেও বুঝতে না পারা, মেজাজের পরিবর্তন, নির্জন ও অন্ধকার জায়গায় বসে থাকা, হঠাৎ চিনি জাতীয় খাবার খাওয়া এবং ঘুমের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মুখ থেকে অদ্ভুত গন্ধ আসা, চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, নানা অজুহাতে টাকা খোঁজা ইত্যাদি। এ ধরনের অনেক পরিবর্তনই মাদকাসক্তির প্রাথমিক অবস্থায় যা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়। এগুলোর কয়েকটি আচরণ দেখলেই বুঝতে হবে সে মাদকাসক্ত।

নানা কারণে একটি মানুষ মাদক গ্রহণ শুরু করলেও পরবর্তীতে নেশা বা আসক্তিতে পরিণত হয়। মাদকাসক্তকে ঘৃণা না করে বরং তাকে রোগী হিসেবে ভাবতে হবে। পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়- এ মতবাদের বিশ্বাস করতে হবে। যদি কেউ মাদকে আসক্ত হয় তাহলে সে কেন মাদকাসক্ত হলো তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার বাবা-মা বা অভিভাবককেই দায়িত্ব নিতে হবে।

শিশুদের ছেলেবেলা থেকেই বুঝাতে হবে মা-বাবা পৃথিবীর সবচেয়ে ভরসার জায়গা। যে-কোনো সমস্যা বা বিষয় তাদেরকে শেয়ার করতে হবে। যদি কোনো কারণে মা-বাবাকে শেয়ার না করা যায় সেক্ষেত্রে এমন একজনকে খুঁজতে হবে যার সাথে সব কিছু শেয়ার করা যায়। হতে পারে সে বন্ধু, মামা, চাচা গোত্রীয় কেউ, বড়ো বোন বা ভাই, অথবা চিকিৎসক। তাদের কাউকেই যদি ভরসা না করা যায় তবে দেশে অনেক কাউন্সিলর আছেন তাদের শরণাপন্ন হতে হবে।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবক, মা-বাবা, আর নিজের ইচ্ছাই পারে মাদকাসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতন হতে হবে। প্রথম পিরিয়ডে মাদক বিরোধী বক্তব্য থাকতে হবে এবং অ্যাসেম্বলীতে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানাতে হবে। মাঝে মাঝে মাদকবিরোধী রচনা, কবিতা, দেয়ালিকা লিখন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলাসহ যাবতীয় কার্যক্রম চালাবে বিরোধী কমিটি। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মাদকবিরোধী বক্তব্যও দিতে পারে। স্কুলভিত্তিক এসব কার্যক্রমই পারে মাদককে নির্মূল করতে। আর সাথে থাকতে হবে অভিভাবকদের সচেতনতা। যাতে শিশু-কিশোররা বন্ধু চিনতে ভুল না করে। খেয়াল রাখতে হবে তারা কার সাথে মিশছে। কারণ সঙ্গ দোষই মাদক গ্রহণের মূল কারণ।

নিবন্ধ

মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসায় আর নেই ভয়

রাবেয়া ফেরদৌস

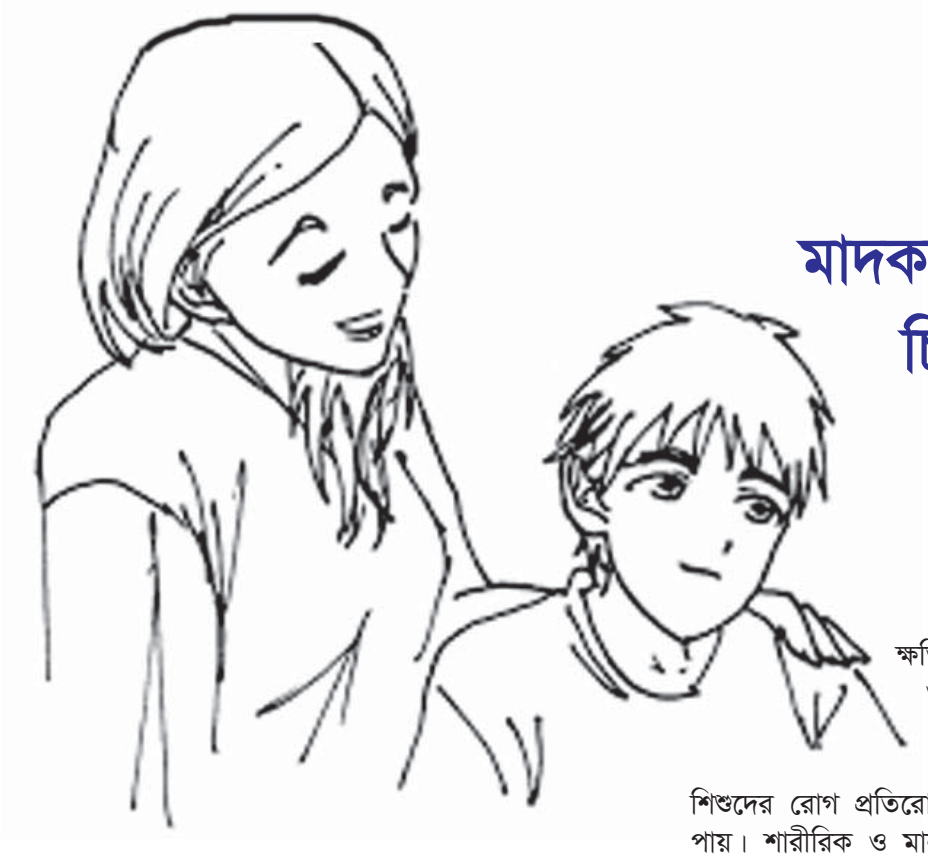

মনিরের বয়স ১৩ বছর। বাড়ি নীলফামারি জেলায়। মনিররা ১০ ভাইবোন। মনির সবার ছোটো। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। মনিরের বাবা রিকশাচালক। যা আয় করে তার থেকে ব্যয় বেশি। মনিরের আরও দুই ভাই ইটের বস্তা টানে। কখনো কখনো সে কাজও অনেক সময় পায় না। তাই মাঝে মাঝে না খেয়েও দিন কাটাতে হয়। পরিবারের স্বচ্ছতার জন্য মনির ঢাকা আসে। ঢাকায় সে লেগুনায় হেলপারি করে। প্রতিদিন ২০০ টাকা রোজগার করে সে। ভালোই চলছিল তার দিনকাল। কিন্তু বন্ধুদের চাপে পড়ে সে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়। প্রথমে গাঁজা দিয়ে নেশা শুরু করে। এরপর ড্যান্ডি, মদ, ফেনসিডিল সবই খাওয়া শুরু করে। এখন প্রতিদিনই সে এগুলো সেবন করে। এরকম মনিরের মতো অনেক ছিন্নমূল শিশু মাদকে আসক্ত।

এ সকল নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য শিশুদের শরীরে নানা রকম শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে। ড্যান্ডি এক ধরনের আঠা, যা মূলত সললিউশন নামে পরিচিত। এতে টলুইন নামে একটি উপাদান আছে যেটি জুতা তৈরি ও রিকশায় টায়ার টিউব লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি খেলে ক্ষুধা ও ব্যথা লাগে না। দীর্ঘমেয়াদি খেলে মস্তিষ্ক, যকৃত ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদকাসক্ত শিশু ও কিশোররা এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে ৮০ ভাগ। এছাড়াও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া, টাকা চুরির প্রবণতা বাড়া, পড়াশোনায় মনোযোগী না হওয়া, নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো করতে না চাওয়া, ঝগড়াপ্রবণ হওয়া, পরিবারের কথা না শোনা, ওজন কমে যাওয়া, খাওয়ার অরুচিসহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়।

মাদকাসক্ত শিশুদের প্রিয়োজন সঠিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন। এক্ষেত্রে পুনর্বাসন সেবাটি একটি টিমের মাধ্যমে দেওয়া হয় যেখানে রয়েছেন :

- সাইকিয়াট্রিস্ট
- সাইকোলজিস্ট
- অকুপেশনাল থেরাপিস্ট
- সোস্যাল ওয়ার্কার

অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসা

অকুপেশনাল থেরাপির মূল লক্ষ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে তাকে দৈনন্দিন কার্যকলাপের সকল দিকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা। যেমন :

- ব্যক্তিগত কাজে স্বাবলম্বিতা
- কর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা
- সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী

- বিনোদনমূলক বা অবসর কার্যকলাপে অংশগ্রহণ
- পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মাদকাসক্ত শিশুর জন্য অকুপেশনাল থেরাপি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এর কারণগুলো হলো:

১. অকুপেশনাল থেরাপিস্টগণ রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যান্য হেলথ প্রফেশনালদের সাথে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমে থাকেন।

২. এ রোগীদের ঔষধ খাওয়ার মাধ্যমে সুস্থ হবার পাশাপাশি সমাজে পুনরায় ফিরে যাওয়া এবং সুস্থ ও সঠিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্টগণ কাজ করে থাকেন।

৩. পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, পেশাগত বা বিনোদনমূলক কাজকর্মে রোগীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তাদের মাঝে উচ্ছৃঙ্খল ও আক্রমণাত্মক আচরণ দূর করা সম্ভব। এক্ষেত্রে রোগীকে তার পেশাগত ও বিনোদনমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাতে একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. ঔষধের পাশাপাশি রোগীদের বিভিন্ন গ্রুপ এক্টিভিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের যে সকল সামাজিক দক্ষতাসমূহের সমস্যা আছে ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা সম্পর্কে ট্রেনিং দেবার জন্য একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৫. দৈনন্দিন কাজকর্ম , যেমন: নিজের খাওয়া, গোসল করা, জামাকাপড় পরা, ব্রাশ করা, খেলাধুলা করা- এ কাজগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমে যথাসম্ভব রোগীদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে এবং পুনরায় তাদের কাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট দরকার।

৬. একজন মানুষ যখন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরে তখন তার স্বাভাবিক জীবনের কাজকর্ম যেমন: খাওয়া, কাপড় পরা, গোসল করা ইত্যাদি করার মতো সামর্থ থাকে না। তখন সেই কাজটিকে অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিংবা করতে সে ভয় পেতে পারে। তখন একজন অকুপেশনাল থে রাপিস্ট পারে তার কাজটিকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং কাজটিকে আনন্দময় করে কাজটিতে অভ্যস্থ করে তোলা।

৭. যে সকল রোগীর মানসিক সমস্যার কারণে যেমন: মনোযোগ, সমস্যার সমাধান, গুছিয়ে কাজ করার দক্ষতা এবং সামাজিক দক্ষতার সমস্যা থাকে তাদের বিভিন্ন এক্টিভিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৮. একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রোগীদের একটি রুটিনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করেন।

মাদকে আসক্ত একটি শিশুর পুনর্বাসনে অকুপেশনাল থেরাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা। তাই সরকারি মানসিক হাসপাতালে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। শিশুদের যথাসম্ভব মাদকের নেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। সর্বোপরি পিতা মাতার সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

শপথ

মো. ইহসান আহমেদ

মাদক শরীর ধ্বংস করে
আরো করে দেশ ও সমাজ
মাদকমুক্ত জাতি গড়তে
শপথ নিবো আজ।
সত্য সুন্দর জীবন গড়তে
মাদককে বর্জন করি
সবাই মিলে একসাথে
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি।
মাদক যারা বিক্রি করে
তারা দেশের শত্রু
এই মাদক নিয়ে আসে
বাবা-মায়ের অশ্রু।

১০ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা আছে আশপাশেই

জান্নাতে রোজী

শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আমাদের আগামী দিনের প্রত্যাশা হিসেবে শিশু-কিশোরদের নিয়ে বুক বাঁধি, স্বপ্ন দেখি–তারাই একদিন সুখি-সমৃদ্ধ জাতির কর্ণধার হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সমাজ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল আমাদের এই শিশু-কিশোররা কিছু অসাধু মানুষের খপ্পরে পড়ে জড়িয়ে পড়ছে নানা অপকর্মে। বিষাক্ত মাদকের নেশা, মাদক চোরাচালান, বাজারজাত ও বিপণনে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বুঝে না বুঝে জড়িয়ে পড়ছে কোমলমতি শিশুরা।

রাজধানী ঢাকায় দুই লাখেরও বেশি পথ শিশু রয়েছে। যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, পথশিশুদের ৮৫ ভাগই কোনো না কোনোভাবে মাদক সেবন করে। জাতীয় মানসিক ইনস্টিটিউটের সূত্র মতে, ঢাকা বিভাগে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। মাদকসক্ত ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শিশু-কিশোররা প্রথম সিগারেট দিয়ে নেশার জগতে প্রবেশ করে। এরপর আস্তে আস্তে তারা অন্যান্য নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত শিশুরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। মাদকের বিষাক্ত নিকোটিনের কারণে শরীরের কোষগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এছাড়া, টাকা চুরির প্রবণতা বাড়া, পড়াশোনায় মনোযোগী না হওয়া, কর্মের শক্তি কমে যাওয়া, ঝগড়াপ্রবণ হওয়া, পরিবারের কথা না শোনা, ওজম কমে যাওয়া, খাওয়ায় অরুচিসহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

মাদকাসক্ত এসব শিশুদের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে ঢাকায় প্রথম ৪০ শয্যার কেন্দ্রীয় মাদক নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে সরকার। বর্তমানে ঢাকার বাইরে রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামেও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজধানীসহ সারাদেশে বেসরকারি উদোগে বর্তমানে ১৮৮টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো তত্ত্বাবধান করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এছাড়াও অধিদপ্তর গণসচেতনতা বাড়াতে এনজিওদের সহায়তায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পোস্টার ও প্রচারপত্র বিতরণ করছে।

সরকারি মাদকসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের ঠিকানা

১. কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৪৪৩, তেজগাঁও, ঢাকা, শয্যা-৪০টি (শিশুদের জন্য ১০টি)।

২. চট্টগ্রাম মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, ১১৫, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম, শয্যা-৫টি।

৩. রাজশাহী মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, ২০৪/২, উপ-শহর, ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী, শয্যা-৫টি।

৪. খুলনা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, ২ কেডিএ এভিনিউ, ময়লাপোতা রোড, খুলনা, শয্যা-৫টি।

ক) মাদকসক্ত যে-কোনো ব্যক্তি এ নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন।

খ) দরিদ্রদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্যদের স্বল্পমূল্যে আবাসিক এবং অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

গ) এছাড়াও অধিদপ্তর অনুমোদিত বেসরকারি চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহ থেকেও চিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়।

ঢাকায় অনুমোদনপ্রাপ্ত ছয়টি নিরাময় কেন্দ্র হলো- মধ্যবাড্ডায় সেতু, এলিফ্যান্ট রোডে সেবা, মোহাম্মদপরের ইকবাল রোডে ক্রিয়া, মিরপুর ১ নম্বরে ঘরে ফেরা, উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের লাইট হাউস ক্লিনিক এবং খিলক্ষেতে দিশা।

গল্প

আমার বাজানরে ফিরায়ে দ্যাও...

মুস্তাফা মাসুদ

পলাশপুর গ্রামের উত্তর মাথায় যে বাড়িটি, সেটিতে এক সময় আমার খুব যাওয়া-আসা ছিল। এসএসসি পরীক্ষার সময় ওই বাড়িতে কত রাত কেটেছে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য, তার হিসাব নেই।

গাছগাছালিতে ছাওয়া নিরিবিলি পরিবেশ। দু-একটা শালিক বা চড়ুই মাঝে মাঝে ওড়াউড়ি করে। মিষ্টি সুরে গানও গায় মন খুলে। নারকেল আর খেজুর গাছের চিরল চিরল পাতাগুলো যখন হালকা হাওয়ায় দুলে তখন যে-কারো মন জুড়িয়ে যায়। এখানে পড়তে বসলে যেন তাড়াতাড়িই পড়া তৈরি হয়ে যায়।

বাড়িটি আমার প্রিয় বন্ধু কাদেরদের। পূর্বপাইকপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুল, তারপর বাঘারপাড়া হাই স্কুল সব মিলিয়ে দশটা বছর কাদেরের সঙ্গে পড়েছি। এত শার্প ব্রেন আমি আর দেখিনি। একটু পড়লেই সব জলের মতো ওর কাছে। হাই স্কুলের ওপরের শ্রেণিগুলোতে উঠে এমন হলো যে, আমরা– ওর সহপাঠীরা ওর সাহায্য ছাড়া পাটিগণিত-বীজগণিত-জ্যামিতি করতেই পারি না। পাটিগণিতের মতো একটা কঠিন সাবজেক্ট ওর কাছে যেন খেলার পুতুল। ক্লাসে ওর প্রথম স্থানটা কেউ কখনো ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ক্লাস ফাইভে গোল্ডেন জিপিএ এবং বৃত্তি, এইটেও তাই। আর এসএসসিতে ও যা করল তা বাঘারপাড়া হাই স্কুলের ইতিহাসে প্রথম। ১৯৫৮ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর এই ষাট বছরে ওই-ই প্রথম বোর্ডে স্ট্যান্ড করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। আমরা সবাই ওর সাফল্যে গর্বিত। আমি এবং স্কুলের আরো আট-দশজন জিপিএ ফাইভ পেলেও কাদেরকে নিয়েই আমরা মেতে উঠি। গল্পে, আড্ডায় সে-ই মধ্যমণি। ওর প্রাণখোলা হাসি আর ইয়ার্কি-ঠাট্টার বহর দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, এই ছেলে এসএসসিতে স্ট্যান্ড করেছে।

এসএসসির রেজাল্টের পর কাদেরের মা, মানে আমাদের জলি খালা এত খুশি হলো যে, কথা বলতে গেলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলছে। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল: বাবা মন্টু, এত বড়ো একটা খুশির ঘটনা ঘটল আর আমি কিছুই করতে পারব

না, তা হয় না। আমি তোমাদের সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াতে চাই। আমি গরিব মানুষ; অত টাকা কোথায় পাব! সামান্য জমিজমা, তাতে কোনোমতে সংসার চলে; কাদেরের লেখাপড়া চলে। তবুও, ছোটো করে হলেও তোমাদের জন্য আমি একটু আয়োজন করতে চাই। আজ যদি কাদেরের বাপ বেঁচে থাকত...

আমি খালাকে থামিয়ে দিয়ে বলি– খালা, কে বলেছে তুমি গরিব? কাদেরের মতো এমন সোনার টুকরো ছেলে যার আছে, তাকে গরিব বলে কে! ও-ই তো তোমার সাতরাজার ধন মুক্তো-মানিক, তোমার স্বপ্ন, তোমার ভবিষ্যৎ। শোনো খালা, তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। তুমি শুধু ওই সাদা খাসিটা দিবা– ওটা তো কাদেরের জন্যই বড়ো করেছ, না? তাহলে আর চিন্তা কী! ওর এমন খুশির সময়ে খাসিটা জবাই করবা না তো কবে করবা! বাকি আর সব আমরাই ব্যবস্থা করব। কাদের আমাদের বন্ধু, আমাদের এলাকার গর্ব। ওর এত বড়ো ঘটনা এমনি এমনি পার হয়ে যেতে পারে না খালা।

খালাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমরা বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে বসলাম। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সেই টাকায় বাকি সব কেনাকাটা হলো। এমন ব্যবস্থায় কাদের প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল; কারণ, তার ইগোতে লাগছিল– ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো লাগছিল নাকি। কিন্তু আমাদের ধমক আর প্রবল উৎসাহের কাছে ওর সেই পোশাকি ইগো তুলোর মতো উড়ে গেল নিমিষেই। ভোজের আয়োজন হলো যথারীতি। আমাদের সব সহপাঠীকে এবং স্কুলের স্যারদের দাওয়াত দেওয়া হলো। খাসির বিরিয়ানি, মোরগ-পোলাও, দৈ, মিষ্টি- সে এক এলাহি কাণ্ড। এমন জম্পেস আয়োজন গ্রামে সচরাচর হয় না।

কিছুদিন পর কলেজে ভর্তি হওয়ার পালা। কাদের ভর্তি হলো যশোর এমএম কলেজে আর আমি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে। অন্য বন্ধুদের কেউ বাঘারপাড়া কলেজে; কেউ আমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমার মামাবাড়ি নড়াইল বলে ওখানেই ভর্তি হতে হলো। মামাবাড়িতে থেকে অল্প খরচে কলেজে পড়া; বাবা-মা এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। সুতরাং আমি নড়াইলে আর প্রিয় বন্ধু কাদের এমএম কলেজে– দুজনার দুটি পথ দুটি দিকে গেল বেঁকে।

নতুন জায়গায় এসে আবার নতুন বন্ধু। আড্ডা-হইচই। আস্তে আস্তে কাদেরের কথা তেমন আর মনে পড়ে না। আমার মনে হয় কাদেরের অবস্থাও তাই। মাঝে মাঝে মোবাইলে আমাদের কথা হয়, কিন্তু তেমন জমে না। হাই-হ্যালো আর কেমন আছিস দোস্ত এ পর্যন্ত বলার পর যেন সব কথা ফুরিয়ে যায়। তখন 'দেখা হবে দোস্ত' বলে ফোন কেটে দেওয়া।

এভাবে ছয়টি মাস কেটে যায়। শেষে ও আর ফোনই ধরে না। প্রায় সময়ই ফোন বন্ধ থাকে। মাঝে একবার বাড়ি গিয়ে ওর মায়ের কাছে শুনি– বাড়িতেও তেমন ফোন করে না। একমাস-দুমাস পরে বাড়ি আসে, তাও এক বিকেলের জন্য। টাকাপয়সা নিয়েই আবার চলে যায়।

জলি খালা আমার সামনে কেঁদে ফেলে। বলে– আমার কাদের যেন আর আগের মতো নেই, বাবা! সেই টকটকে ফর্সা চেহারা এখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে। শরীরের হাড়গুলো যেন গোনা যায়। আমি জিজ্ঞেস করতেই খেঁকিয়ে উঠে বলে: জানো কত লেখাপড়া? তারপর হোস্টেলের খাবার। স্বাস্থ্য ভালো থাকে কী করে? এসব নিয়ে তোমাকে আর প্যাঁচাল পাড়তে হবে না! টাকা দাও, আমি যাই। অনেক লেখাপড়া। বন্ধুরা আমার জন্য বসে আছে। বাবা মন্টু, কাদেরের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে মাত্র ছয়টি মাসে। যে ছেলে আমার দিকে কখনো চোখ তুলে কথা বলত না; আমি কাছে বসে না থাকলে ভাত খেত না; এমনকি মাথায় হাত বুলিয়ে না-দিলে ঘুমাতে পারত না, সেই ছেলে আমার সঙ্গে ধমক দিয়ে কথা বলে! আর একটু বেশি কথা বললে হয়ত গায়েও হাত দিতে পারে। ওর কী হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ও বাবা মন্টু, কাদের তো তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো না– ওর কী হয়েছে। কোনো কঠিন অসুখে পড়েনি তো আবার!

জলি খালার কান্নাভরা আকুতি আমাকে স্পর্শ করে। আমারো দু-চোখ ভিজে ওঠে। শেষমেষ খালাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি– খালা তুমি চিন্তা করো না। আমি আজই ওর হোস্টেলে যাব। খোঁজ নিয়ে দেখি ওর কী হয়েছে।

সেদিনই বিকেলে আমি যশোর এমএম কলেজের হোস্টেল ক্যাম্পাসে পৌঁছাই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কাদের বাইরে কোথাও গেছে। দারোয়ান বলল– উনি রোজই বিকেলে কোথায় যেন যান রাত নটা-সাড়ে নটার আগে ফেরেন না। বলতে বলতে দারোয়ানের চোখমুখে একটা দুঃখের ছায়া দেখা যায়। কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। দারোয়ান আমাকে হোস্টেলের গেস্টরুম দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। কাদের এলেই সে আমার কথা তাকে বলবে– এ আশ্বাসও দিল। আমি গেস্টরুমে বসে আছি। মনে মনে শক্ত হই– কাদেরের সঙ্গে দেখা না করে আমি এখান থেকে নড়বই না। দরকার হলে সারারাত এই গেস্টরুমেই বসে থাকব। হাতে একটা পত্রিকা ছিল, তাই পড়তে থাকি। কতক্ষণ পড়েছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ কার যেন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আমি উঠে দাঁড়াই। দেখি– দরজা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকছে, তার চেহারা আমার বন্ধু কাদেরের মতোই, তবে বড়োই বেখাপ্পা লাগছে। জলি খালার মুখে যেটুকু শুনেছি, তার চেয়েও ভয়ংকর। আরো কদাকার চেহারা হয়েছে কাদেরের। আমার মুখে কোনো কথাই জোগায় না। ওর দিকে তাকিয়ে কেবল তো-তো করতে থাকি। হঠাৎ ওর তোবড়ানো গালের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল সেই পরিচিত হাসির ঝিলিক। কিন্তু সে-হাসিতে আগের সেই প্রাণ নেই, স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনার কলধ্বনি নেই। আমি কোনোরকমে ওর সঙ্গে হাত মেলাই। তারপর জিজ্ঞেস করি–কী রে দোস্ত, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সেই কখন থেকে আমি তোর জন্য বসে আছি। তা বল, কেমন আছিস?

কাদের আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। তার বদলে একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলল– তুই কী জন্য এখানে মরতে এসেছিস? এই বন্ধু, খাবি? আমার কাছে অমৃত আছে– অমৃত। তুই চাইলেই আমি তোকে দেবো। খেয়ে দেখ, ভারি চমৎকার। বলতে বলতে মেঝেতে ঢলে পড়ে কাদের। টেবিলে পানির বোতল ছিল। আমি তাড়াতাড়ি ওর চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে দিই আর ওর মাথাটা তুলে ধরি আমার কোলের ওপর। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি কাদেরের কী হয়েছে। মাদকের যে নীল দৈত্য আজ আমাদের কিশোর-তরুণ-যুবকদের হাড্ডি-মজ্জা-মগজ চিবিয়ে

খাচ্ছে; ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কত সাজানো সংসার, তারই খপ্পরে পড়েছে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং ব্রিলিয়ান্ট বন্ধু কাদের। আমি ওর মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে কতক্ষণ বসে আছি জানি না। হঠাৎ এক সময় কাদের উঠে বসে। একদম স্বাভাবিক; যেন চমৎকার এক ঘুম থেকে এইমাত্র জাগল সে। সে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বলে– দোস্ত, তুই?

হ্যাঁ, আমি। তোর এ কী অবস্থা!

সে অনেক কথা। পরে শুনিস। এখন রুমে চল। আমার খাবার রুমেই দিয়ে যায় বাবুর্চিরা। যা আছে, তাই দুজনে ভাগ করে খাব, চল। অবশ্য রাতে আমি খুব কম খাই। খেতে তেমন ইচ্ছেও করে না। ঠিক আছে, চল দোস্ত।

ঘরে গিয়ে আমরা ভাত খাই। বড়ো এক টুকরো পাঙ্গাশ মাছের তরকারি আর ডাল। ভালোই লাগল খেতে। কাদের শুধু একটু ডাল চুমুক দিয়ে খেলো তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে ভুরভুর করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমি এই প্রথম তাকে সিগারেট খেতে দেখলাম– অনেক দামি বিদেশি ব্র্যান্ডের সিগারেট। আমি একেবারে থ' হয়ে যাই। যে-ছেলে সিগারেটের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না; এমনকি সিগারেট খাওয়ার জন্য গ্রামের এক সিনিয়র ভাইকে একবার জোরে থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছিল, সে কিনা আজ নিজেই সিগারেট ধরেছে! আবার ভাবি– সিগারেট কেন, মদ-মাদক এসব ধরতেও তো বাদ রাখেনি; সিগারেট তো ওর কাছে নস্যি। আমি ওকে কিছুই বলি না। আমি যা জানতে এসেছিলাম, সব আমার জানা হয়ে গেছে। আমি নীরবে বিছানায় শুয়ে পড়ি। কাদের সিগারেট শেষ করে আরেকটা বালিশ টেনে নিয়ে চাদর ছাড়াই ফ্লোরে শুয়ে পড়ল, কোনো কথাই বলল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি– কাদের তখনো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। গালের দুপাশ দিয়ে গ্যাঁজলা ঝরে পড়ছে। আমার বমি-বমি করতে থাকে। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হই চলে যাওয়ার জন্য– ওর মাকে ওর খবর দিতে হবে না! কাদের ঘুমের মধ্যে বারকয়েক মা মা বলে অস্ফুট শব্দ করল, কিন্তু জাগল না।

আমি আর দেরি করি না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি– আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাইরে এসে দেখি– ভোরের সূর্য সোনালি রং ছড়িয়ে হাসছে। হালকা বাতাসে ক্যাম্পাসের পরিপাটি ঘাস আর ঘাসফুলগুলো আস্তে আস্তে দুলছে। আমার মন থেকে গুমোট ভাবের মেঘটা সরে যায়; কিন্তু কাদেরের ভয়ংকর চেহারা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। কোনোমতে পা টেনেটেনে রাস্তায় আসি। রিকশায় মণিহার। সেখান থেকে নারিকেলবাড়িয়ার বাসে বাড়ি ফিরে আসি দুপুর নাগাদ। কিন্তু তখনই জলি খালার বাড়ি যাই না– যেতে সাহস পাই না। আমি যা দেখে এসেছি, তা এক দুখিনী মাকে কীভাবে বলব? সদা হাসিখুশি জলি খালা এখন এমনিতেই ভেঙে পড়েছে; তার ওপর আমার কথা শুনে সে কি নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারবে? পিতৃহারা একমাত্র সন্তান– ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সব আশা-ভরসার স্থল। সেই ছেলে মাদকের নীল দংশনে আজ ধ্বংস হয়ে গেছে, এ-খবর কোনো মাকে কীভাবে দেওয়া যায়! আমি বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিল জলেশ্বরের দিকে চলে যাই– বাঁশগাড়ি, বুড়িরভূঁই আর আপারকূল হয়ে আবার উলটোমুখো হাঁটি। বাকসারভূঁই, খড়েলমাঠ, চান্দারকুঁড়, কচুগেড়ে– এসব পরিচিত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সময় পার করি। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। চমৎকার অন্ধকার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চারপাশে। আমার বড়ো ভালো লাগে। তখন তাড়াতাড়ি পা চালাই জলি খালার বাড়ির দিকে। মনকে শক্ত করি– যত কঠিনই হোক খালাকে সব খুলে বলতে হবে, কাদেরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে তো এভাবে মরতে দেওয়া চলবে না। এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি যখন জলি খালার উঠোনে পা রাখি, তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। খালা বলে ডাক দিতেই জলি খালা দৌড়ে উঠোনে আসে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করে– মন্টু বাবা, আমার কাদেরের সাথে দেখা হইছে? তার খবর কী?

আমি সব ঘটনা খুলে বলি খালাকে। শুনে খালা যেন পাথর হয়ে যায়। মুখে কোনো কথা নেই। কান্নাও যেন ফুরিয়ে গেছে। চোখ দুটো গোল্লা গোল্লা। খালার এই অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই– পাগলটাগল হয়ে যাবে না তো! আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি– খালা, চিন্তা করো না। ওকে ভালোভাবে চিকিৎসা করালে ও আবার ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু কে শোনে কার কথা! খালা দুহাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকে আর মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে বলে: তোমরা আমার বাজানরে ফিরায়ে দ্যাও... ফিরায়ে দ্যাও...

মাদককে না বলি

চকলেট-কেক আইসক্রিমকে বলি

হ্যাঁ

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক মানুষকে তিলে তিলে শেষ করে দিতে পারে। তাই আমরা নিজেদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে মাদককে না বলে চকলেট, কেক, আইসক্রিম খাই। এসো জেনে নেই এসব মুখোরোচক খাবারগুলো সম্পর্কে।

চকলেট

চকলেট হলো প্রক্রিয়াজাত খাবার যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোকোয়া গাছের বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়। কোকোর জন্ম ল্যাটিন আমেরিকায়। ১৯/২০ শতকে কোকো আসে চকলেট আকারে। চকলেট নামটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা স্কোকোলেট থেকে। যার অর্থ অম্ল পানীয়। ৭ জুলাই বিশ্ব চকলেট দিবস। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় চকলেট হচ্ছে ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক। জর্জ ক্যাডবেরি স্পেন থেকে রেসিপিটি এনে প্রথম এটি বানান ১৯০৫ সালে। নিউহস, লিন্ডট, লিওনিদাস, হারশেস, ফেরারো, ক্যাডবেরি ইত্যাদি চকলেটের বিখ্যাত ব্র্যান্ড।

ভিন্ন স্বাদের সেরা ১০ চকলেট

অ্যামেডেই– নামক চকলেটটি দেখতে খুবই সুন্দর, কামড় বসালে এর কুড়মুড় শব্দটাও শুনতে ভালো লাগে।

লিওনিডাম চকলেটের স্বাদ সবার জন্য সমান। তাই এই চকলেটের একটা মজার স্লোগান 'ডেমোক্রেসি ইন চকলেট' অর্থাৎ চকলেটের গণতন্ত্র।

বভেটি-চকলেটটি ইতালীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি। তাদের ১৫০টি ফ্লেভারের মধ্যে ধনিয়া ফ্লেভারের চকলেটও রয়েছে। ভালরোনা-কে চকলেটের জগতের রয়েল রোলস বলা হয়।

গোটা পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন মিশ্রণের নানা ব্র্যান্ডের চকলেটের স্বাদ উপভোগ করে থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় চকলেট ব্র্যান্ড হলো-

কিটক্যাট, মাস, গ্যালাক্সি, ক্যাডবেরি, টোব্লেরোন, প্যাটচি, গাইলিয়ন, মিরারদেল্লি, লিন্দত ও শপ্রুংলি, ফেররের ও রোচার।

চকলেট কেন খাবে

ডার্ক চকলেটে রয়েছে শক্তিশালী এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য উপকারী উপাদান যা শরীরে প্রবেশ করা

মাত্র টক্সিক উপাদান বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে দেহের ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। ডার্ক চকলেট খেলে চুল পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। ব্রেন ফাংশনের উন্নতি ঘটায়। স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের বিকাশ ঘটে।

চকলেট নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণাগুলোতে বলা হয়েছে এটি উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক করে এবং হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক রাখে ও মাসনিক চাপ কমায়।

কালো কুচকুচে ডার্ক চকলেটে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে কিন্তু দুধ মেশানো বা সাদা রঙের চকলেটে সেটা থাকে অনেক কম।

চকলেটের আরো একটি মজার খবর হলো-জার্মানির কোলন শহরে জাহাজের মতো দেখতে ৪০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে তিন হাজার বছর আগের ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি চকলেট জাদুঘর।

চকলেটের মূল উপাদান কোকো গাছ ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতে ভালো জন্মে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় কোকো চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। গবেষকদের মতে এ কারণেই আগামী ৪০ বছরের মধ্যে কোকো গাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

হিম হিম আইসক্রিম কেমন করে এল

আইসক্রিম নিয়ে নতুন করে কিছুই বলা নেই। আইসক্রিম ভক্তরা সবাই এর স্বাদ জানে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আইসক্রিমের বয়স হাজার বছরের বেশি। প্রাচীনকালে ফলের সাথে বরফকুচি মিশিয়ে আইসক্রিম বানানো হতো। খ্রিষ্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে গ্রিকরা মধু ও ফল মেশানো বরফ খেত। আধুনিক আইসক্রিমের উদ্ভব ২০ শতকে ফ্রিজ উদ্ভাবনের পরে। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ১০০ রকমের আইসক্রিম পাওয়া যায়।

আইসক্রিম দিবস

আইসক্রিমের জনপ্রিয়তা দেখে ১৯৮৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান জাতীয় আইসক্রিম মাস ও দিবস প্রবর্তন করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর জুলাই মাসকে আইসক্রিম মাস ও জুলাই মাসের তৃতীয় রোববার জাতীয় আইসক্রিম দিবস হিসেবে পালিত হয়।

তোমরা জেনে অবাক হবে আমেরিকায় প্রতিবছর একজন মানুষ গড়ে ২০ লিটার আইসক্রিম খায়। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ ও নিউজিল্যান্ডে ২০ লিটার আইসক্রিম খেয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড়ো আইসক্রিম

২০০৬ সালে চীনারা ৪.৮ মিটার দীর্ঘ, ৩ মিটার প্রশস্ত ও এক মিটার উঁচু একটি আইসক্রিম বানায় যেটির ওজন ছিল ৮ টন। এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড়ো আইসক্রিম হিসেবে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড রয়েছে।

আইসক্রিমের জানা-অজানা

* ১৮৫১ সালে আইসক্রিমের প্রথম শিল্প উৎপাদন শুরু হয় আমেরিকার বোস্টনে
* সারা পৃথিবীতে আইসক্রিম সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়
* আমেরিকায় ৯০% পরিবার আইসক্রিম খায়
* ১ গ্যালন আইসক্রিম তৈরিতে ১২ গ্যালন দুধের প্রয়োজন হয়
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি উদযাপিত হয় আইসক্রিম খাওয়ার মাধ্যমে
* ১ কাপ ভ্যানিলা আইসক্রিমে = ২৭০ ক্যালরি।

তাই মন ভালো রাখতে আইসক্রিমের চেয়ে ভালো খাবার আর কিছুই হতে পারে না।

কেক কেন খাবে

কেক বানাতে ডিম, দুধ, চিজ, চিনির ব্যবহার করতে হয়। ফলে এই কেক খেলে শরীরে সেরোটোনিনের পরিমাণ বাড়বে। এই উপাদান শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি হলে মন ভালো থাকে। মুড ভালো থাকে।

* ডিমের ভিটামিন ই ফ্রি ব্যাডিক্যাল নষ্ট করে ও স্কিন ক্যানসার প্রতিরোধ করে।
* যখন শরীরে চিনির ঘাটতি হয় তখন শক্তি কমে যায়। চিনি খেলে শরীর তাৎক্ষণিক শক্তি পায়। কেননা কেক হচ্ছে চিনির একটি বড়ো উৎস।

নিবন্ধ

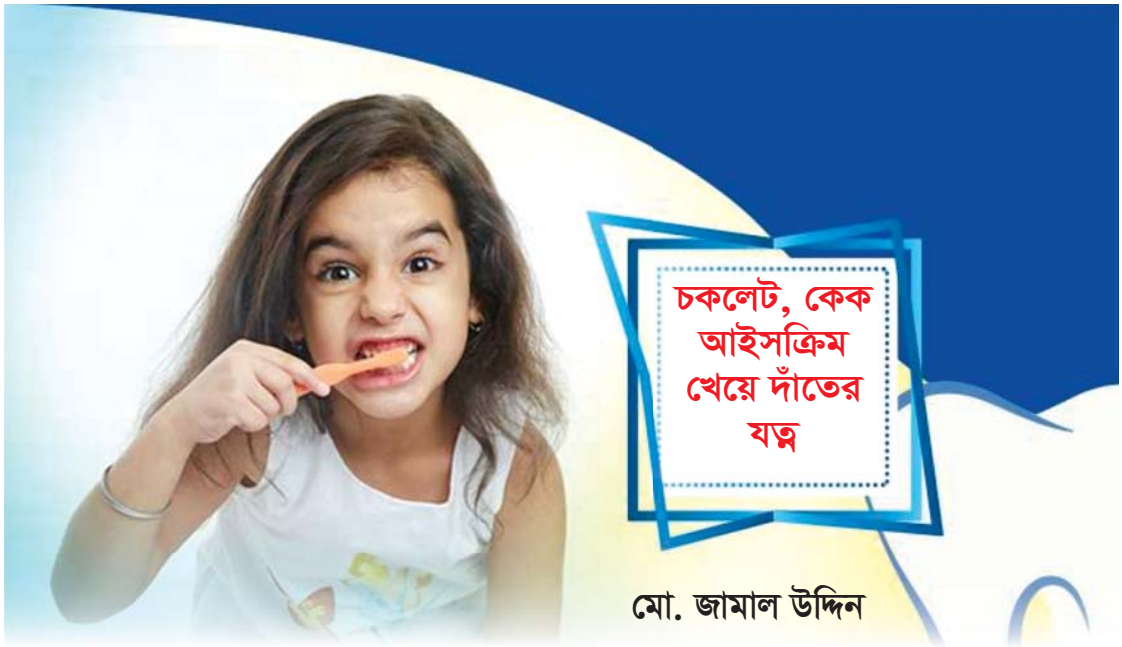

চকলেট, কেক আইসক্রিম খেয়ে দাঁতের যত্ন

মো. জামাল উদ্দিন

দাঁতের ক্ষয় ছোটোদের এক অতি সাধারণ সমস্যা। দাঁতের রোগ এমন এক সমস্যা যেখানে কিছু ক্ষারীয় বস্তু থেকে কিছু ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি ঘটে ও দাঁতের বাইরের স্তর বা এনামেল নষ্ট করে দেয়। আস্তে আস্তে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া স্তর থেকে গর্ত বা ফুটো সৃষ্টি হয়।

মাড়ি থেকে একটা দাঁত গজালেই, বাবা-মায়ের চিন্তা শুরু হয় সেটার যত্ন নিয়ে। আবার বাচ্চার শরীরে প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালসিয়াম না থাকলে অনেক সময় বাচ্চাদের দাঁতের ক্ষয় হয়।

গবেষকদের মতে দাঁতের সমস্যার মূল কারণ খাবার-দাবার আজকাল বাচ্চারা খুব বেশি মাত্রায় চিনি, চকলেট বা ক্ষারীয় পদার্থ খেয়ে থাকে, যা দাঁতের ক্ষতি করে। বাচ্চাদেরকে লোভনীয় ওসব খাবার থেকে দূরে রাখা তো সম্ভব নয় কিন্তু এসব খাবারের পর দাঁতের যথাযথ যত্ন নিতে হবে।

সহজে দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধের দুটো উপায় আছে। এক্ষেত্রে প্রথম উপায় হলো-দিনে অবশ্যই দুবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে। দ্বিতীয় উপায় হলো-চিনি, চকলেট ও মিষ্টি জাতীয় খাবার সাথে সাথেই মুখে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। যতটা সম্ভব চকলেট, আইসক্রিম, কেক, পেস্ট্রি, পুডিং, মধু, জ্যাম-জেলি, কেকের ক্রিম, কোমল পানীয়, জুস কম খেতে হবে। খেলেও সাথে সাথেই ভালো করে কুলকুচি করে নিতে হবে বা ব্রাশ করতে হবে। যেন এগুলোর কোনো টুকরা দাঁতের মাঝে আটকে না থাকে।

অনেক সময় দাঁতের ক্ষয়জনিত কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তবে তার আগে স্বাভাবিক প্রতিকারগুলো করে দেখা যেতে পারে। যেমন কুসুম গরম লবণ পানি দিয়ে মুখ কুলকুচি করলে উপহার পাবে। হলুদ, লবঙ্গ, রসুন ও দারচিনির তেল এগুলো খুবই প্রচলিত ঘরোয়া উপশমের উপায়।

এগুলো বাচ্চাদের জন্য করা সহজ এবং আরামদায়ক। আবার, এগুলোর কোনো ক্ষতিকারক ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। এছাড়া ছোট্ট শিশুর দাঁত ও জিভ নরম ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে। এতে বাচ্চার মুখ ও দাঁত ছোটো অবস্থা থেকেই পরিষ্কার থাকবে।

একটা সুন্দর হাসি সবার জন্যই কাম্য। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা যদি না বোঝা যায় তাহলে সারা জীবন পস্তানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই ছোটোবেলা থেকেই দাঁতের যত্ন নিতে হয়।

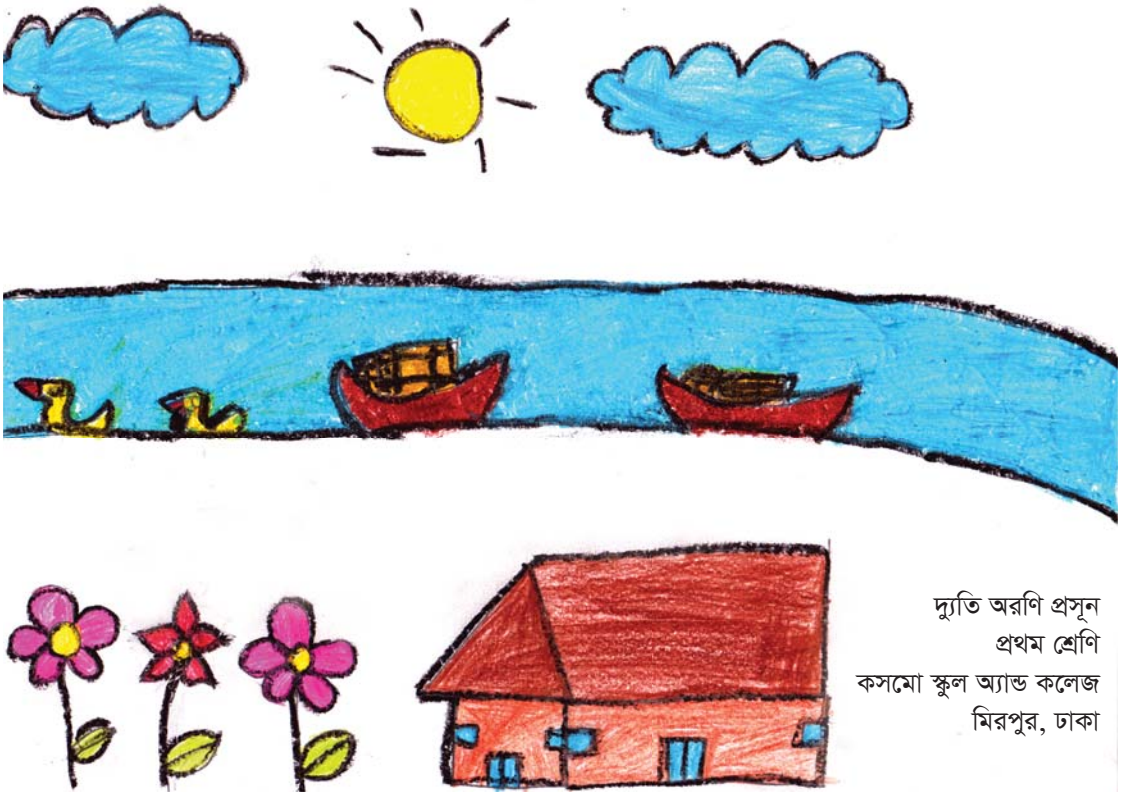

দ্যুতি অরণি প্রসূন
প্রথম শ্রেণি
কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ
মিরপুর, ঢাকা

দীপনের রোজনামচা

সৈয়দা নাজমুল নাহার

দীপন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ওরা দুই ভাইবোন। দীপন বড়ো আর বোন পিয়া আড়াই বছরের। দীপনের বাবা ছোটোখাটো একটা সরকারি চাকরি করেন। তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তাই দীপনের মা দরজি কাজ করেন। আশপাশের বাড়ির মেয়েদের জামাকাপড় সেলাই করে দেন। তাতে বাড়তি দুটো পয়সা আসে দীপনের মায়ের হাতে। সেই টাকা দীপনের পড়াশোনা এবং কখনো বোনের চিকিৎসার খরচ হয়। মা খুব হিসাবি আর পরিশ্রমী। তাই বাড়ির আশপাশে সবজি চাষ করেন। যার ফলে বাজার থেকে সবজি কিনতে হয় না আবার প্রতিবেশীদেরও মাঝে মাঝে বিলানো যায়। মা বলেন, এতে নাকি শান্তি আর আনন্দ পাওয়া যায়।

ইদানীং দীপনের স্কুলে পড়শোনার বাইরে অনেক কিছু শেখাচ্ছে। দীপনের কাছে সেই গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন দীপনের মা-বাবা।

স্কুল থেকে ফিরলেই মা ড্রেস বদলিয়ে এক গ্লাস লেবুর শরবত ধরিয়ে দেন। শরবত শেষ করে সোজা গোসলে, তারপর খাবার টেবিলে। সেখানেই চলে রোজকার স্কুলের গল্প। আজ শেখাল কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়। দাঁত তো আমরা রোজই ব্রাশ করি। আজ দীপনদের ক্লাসে ডেনটিস্ট এসেছিলেন। তিনি দেখালেন কীভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হয়। ওপর-নীচ-সাইডে রাতে খাওয়ার পর অবশ্যই ব্রাশ করতে হবে। তা না হলে দাঁতের গায়ে খাবারের কণা লেগে থাকে আর তা পচে জীবাণু তৈরি করে, দাঁতে পোকা হয়। মাড়ির অসুখ হয়। প্রতিবার খাবার শেষে দাঁত ব্রাশ করা উচিত। যদি প্রতিবার সম্ভব না হয় অন্তত কুলি করা দরকার। বাচ্চারা চকলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খায়। তাদের অবশ্যই প্রতিবার এসব জিনিস খাবার পর ব্রাশ অথবা কুলি করাতে হবে। দাঁতে খাদ্যকণা আটকে গেলে সুতা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কখনো ধারালো কিছু দিয়ে দাঁত খোঁচানো উচিত নয়।

খোঁচা লেগে মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আর বড়ো ধরনের বিপদ হতে পারে। ব্রাশ তো আমরা করব নিয়মিত। আর সেই সাথে নিমের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করব। এতে দাঁত জীবাণুমুক্ত ও সুস্থ থাকবে। কারণ আমাদের নবিজী (সা.) মেসওয়াক করতেন। আজ দীপনের ক্লাসে নখ কাটা নিয়ে কথা হয়েছে। দীপন খাবার টেবিলে সেই গল্পই করছে। জানো মা, নখ কাটা খুবই জরুরি। নখ বড়ো থাকলে আমরা খেলাধুলা করলে হাতে ময়লা লাগে, সেই ময়লা নখে জমা হয়। হাত ধুলেও নখের ময়লা যায় না। আর সেই হাত দিয়ে খাবার খেলে সেই ময়লা খাবারের সাথে পেটে যায়। আর নানারকম পেটের অসুখ হয়। বিশেষ করে ডায়রিয়া হয়। ছোটোদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বলে বেশি আক্রান্ত হয়। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে খাবার স্যালাইন- গুড় বা চিনি, এক চিমটি নুন মিশিয়ে বানিয়ে মা তাই বার বার খাওয়াতে থাকেন। সঙ্গে ডাবের পানি, চিড়ার পানিও দেন। এসময় ভাতের মাড়, ডালের পানিও তরল খাবার বেশি দিতে হবে। তবে ডায়রিয়া সেরে গেলেও কদিন একটু বেশি খাবার দিতে হবে। আর জরুরি কথা হলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, প্রতিবার পায়খানা থেকে বেরিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।

দীপনের স্কুলে আজ শেখালো খালি পায়ে হাঁটা নিয়ে। সেই গল্পই মাকে বলছে দীপন—বাড়ির আশপাশে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করা উচিত নয়। এমনিতে পশুপাখির বিষ্ঠা বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটির সাথে মিশে যায় আর জীবাণুতে পরিণত হয়। তাতে যদি আমরা খালি পায়ে হাঁটি তাহলে জীবাণু পায়ের তালুর চামড়া ফুটো করে ঢুকে যায়। আর সেই জীবাণু এক সময় পেটে চলে যায়, তা থেকে ক্রিমি হয়। এছাড়া অনেক অসুখ হয় যেমন: জ্বর, আমাশয় ইত্যাদি। আর যদি আমরা সেন্ডেল পরে চলি তাহলে জীবাণু আমাদের ছুঁতেও পারবে না। আমরা সুস্থ থাকব। তাই আমাদের বাড়ির চারপাশ অবশ্যই পরিষ্কার রাখব।

দীপনের স্কুলে আজ পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কথা বলেন আপা। মাকে তাই বলছে দীপন, জানো আমাদের পৃথিবী নামের গ্রহটি অনেক সুন্দর। আল্লাহর অনেক নেয়ামত আমরা ভোগ করি। আলো-বাতাস-নদী সাগর-মহাসাগর আরো কত কী! সুখাদ্য ফলমূলও। তাই আমাদের চারপাশ সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অকারণে গাছকাটা বন্ধ রাখতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। নোংরা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে। প্লাস্টিক, পলিথিন, চিপস-এর প্যাকেট নদী বা জলাশয়ে ফেলা যাবে না। মানুষের তৈরি বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে পানি। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ পানির অভাব হবে। তাই পানির অপচয় করা যাবে না। বাড়ির চারপাশে বোতল, ডাবের খোল রাখা যাবে না, এতে পানি জমে আর মশার বংশ বিস্তার করে। ফলে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ ছড়ায়। মা অবাক হয়ে শুনছেন, এ কদিনে ছোটো দীপন কত কী শিখেছে।

ছোটো বোনের মেহমানদারি

জাজাফী

জেএসসি পরীক্ষার পর বেশ লম্বা ছুটি আমার হাতে। সারাদিন টিভি দেখা, ঘুরতে যাওয়া, গেমস খেলার পরও আমি চেষ্টা করি কিছুটা পড়াশোনা করতে। গল্পের বই বেশি পড়ছি। তবে ক্লাস নাইনের বইও সংগ্রহ করে পড়তে চেষ্টা করছি। আবার কখনো কখনো কোনো কিছুই পড়তে ইচ্ছে করে না। এই যেমন আজকে পড়ার টেবিলে বসে আছি কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। অনেকক্ষণ ধরে তাই কলম নিয়ে আঁকআঁকি করছি। ওদিকে বাসায় মেহমান এসেছে। মেহমান বলতে আমার আম্মুর কলিগরা এসেছে সাথে তাদের বাচ্চাকাচ্চা।

আম্মু এর মাঝেই আমাকে দুবার ডাক দিয়ে বলেছেন শঙ্খনীল ড্রয়িংরুমে যাও। মেহমানদের সাথে গল্প করো।

আমি যাইনি। আম্মু নিশ্চয়ই এ জন্য আমাকে বকবে। তারপরও কেন যেন যেতে ইচ্ছে করেনি। আমার একটা পিচ্চি বোন আছে। আমার নাম নীল তাই আম্মু আমার নামের সাথে মিলিয়ে ওর নাম রেখেছিল নীলাঞ্জনা। আমি অবশ্য নীলাঞ্জনাকে ছোট্ট করে নীলা বলে ডাকি। সবাই যেমন আমার নাম শঙ্খনীল হলেও ছোটো করে নীল ডাকে ঠিক তেমনি।

আম্মু ডাকার পরও যখন আমি মেহমানদের সামনে যাইনি তখন আমার আদরের বোনটাকে আম্মু বলেছে দেখো তো তোমার ভাইয়া কী করছে?

আমি যখন খাতায় এলোমেলো আঁকাআঁকি করছি এমন সময় আমার ছোটো বোনটা এসে বলল, ভাইয়া ভাইয়া তোমার কাছে ক্রিম আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। কিন্তু ক্রিম কী করবা?

সে বলল, মেহমান আসছে তাই ক্রিম লাগবে!

আমি বললাম মেহমান আসলে ক্রিম কেন লাগবে? মেহমান ক্রিম দিয়ে কী করবে?

সে তখন বলল, আরে বোকা ভাইয়া তুমি কী জানো না মেহমানকে নাশতা দিতে হয়।

আমি বললাম, জানি আপু। এবার তুমি বলো মেহমানকে নাশতা দিতে হলে ক্রিম কেন লাগবে?

আমাদের নীলা তখন বলল, ভাইয়া মেহমানকে নাশতা দেবো। কিন্তু যে বিস্কুট দেবো সেটাতে ক্রিম নেই। ওদিকে আম্মু বলেছে বয়াম থেকে ক্রিমওয়ালা বিস্কুট দিতে! তাই তোমার কাছে আসলাম ক্রিম নিতে, যেন বিস্কুটে ক্রিম লাগিয়ে দিতে পারি। বুঝতেই পারছ প্রেসটিজের ব্যাপার। বিশেষ করে আম্মুর কলিগেরা এসেছে সাথে তাদের বাচ্চাকাচ্চা। ক্রিম ছাড়া বিস্কুট কী মেহমানকে দেওয়া যায়? এতে আম্মুর প্রেসটিজ থাকবে? সবাই বলবে লিপির বাসায় গিয়েছিলাম আর আমাদেরকে নাশতার সময় ক্রিম ছাড়া বিস্কুট দিয়েছে!

আমি মুখটাতে গাম্ভীর্য এনে বললাম, তুমি তো ঠিকই বলেছ, আম্মুর কলিগদেরকে কি আর ক্রিম ছাড়া বিস্কুট দেওয়া যায়?

আজ আমার মাথায় দুষ্টুমি ভর করল। নীল যদি নীলাকাশে পাখি হয়ে ইচ্ছেমতো ডানা-ই না মেলতে পারে তাহলে আর শঙ্খনীল হয়ে লাভ কী! ভাবলাম আজ না হয় একটু দুষ্টুমি করাই যাক! আমি টেবিল থেকে ক্রিমের কৌটোটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, এই ক্রিম তো মিষ্টি লাগবে না। তাহলে? নীলা বলল, তুমি চিন্তা করো না ভাইয়া। আমি ক্রিমে ফ্লেভার আনার জন্য চিনি মিশিয়ে দেবো।

এরপর আমি অপেক্ষায় থাকলাম ওদিকে কী রিঅ্যাকশন হয় সেটা দেখার জন্য। জানি ধরা পড়লে নীলাঞ্জনা আম্মুকে সব বলে দেবে। আর আম্মু আমাকে ধরবে। আম্মু রান্নাঘরে ব্যস্ত আর নীলা একা একাই মেহমানদের নাশতা দিচ্ছে। এইটুকু পিচ্চি হলে কী হবে, খুবই অতিথিপরায়ণ। তার আতিথেয়তায় সবাই খুব মুগ্ধ। এতটাই মুগ্ধ যে মুখে নেওয়া ক্রিম লাগানো বিস্কুট খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে। কিন্তু কিচ্ছু টের পায়নি! আমি আমার বোনকে মনে মনে বাহবা দিয়েছি। ও নিশ্চয়ই এমনভাবে চিনির ফ্লেভার তৈরি করেছে যে মেহমানরা বুঝতেই পারেনি তারা যে ক্রিম খাচ্ছে তা মুখে দেওয়া ক্রিম।

পরদিন আম্মু অফিসে গেলে সব কলিগরাই বিস্কুটের প্রশংসা করে বলেছে বিস্কুটের ক্রিমটা খুব সেন্টওয়ালা ছিল এবং টেস্টও আন্যরকম ছিল। তবে রাতে একটু পেটে সমস্যা হচ্ছিল সবারই। বিস্কুটের ক্রিম এবং সেন্ট এই দুটি কথা আম্মুর কানে বেজেছে। খটকাও লেগেছে কিন্তু সাংবাদিক হওয়ায় আম্মু বিষয়টা চেপে গেছে।

বাসায় ফিরে সবার আগে আম্মু ড্রয়িংরুমে বসে নীলাঞ্জনাকে পাশে বসিয়ে বিস্কুটের ক্রিমের বিষয়ে জানতে চাইছে। আম্মু যে মেহমানদের ক্রিমওয়ালা বিস্কুট দিতে বলেছিল!

তখন নীলা বলেছে, আসলে আম্মু হয়েছে কী তুমি তো আমাকে ক্রিমওয়ালা বিস্কুট দিতে বলেছিলে। কিন্তু সেই সব বিস্কুট তো আমি আর ভাইয়া আগেই খেয়ে ফেলেছিলাম। পরে তুমি যখন ক্রিমওয়ালা বিস্কুট দিতে বললে তখন ভাবলাম এখন ক্রিমওয়ালা বিস্কুট কোথায় পাই? শেষে বুদ্ধি করে ভাইয়ার কাছ থেকে মুখে লাগানো ক্রিম নিয়ে তাতে চিনি মিশিয়ে নতুন ফ্লেবার বানিয়ে মেহমানদের দিয়েছি। তারা তো খুবই পছন্দ করেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি!

নীলাঞ্জনার কথা শুনে আম্মু প্রথমে হো হো করে হেসেছে। তারপর আমাকে ডেকেছে নীল এই দিকে আসো। আমি তো আম্মুর কথা শুনেই বুঝতে পারছি কী ঘটতে চলেছে। আমার কানের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে আম্মু কী করেছিল। ছোটো বোনের মেহমানদারির স্মৃতি চিহ্ন এখনো আমার কানে লেগে আছে।

প্রজাপতি

জাফরুল আহসান

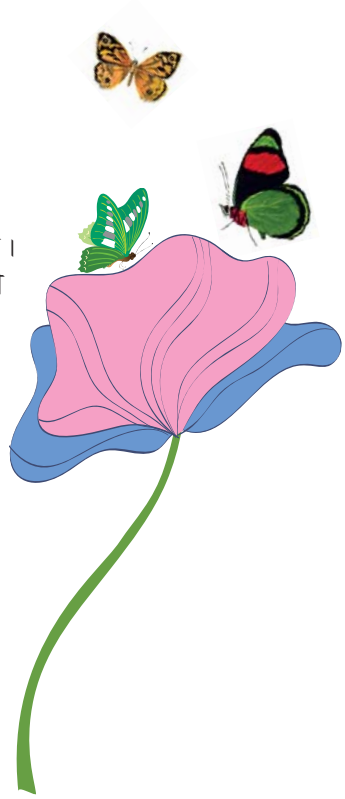

প্রজাপতি প্রজাপতি
বুঝি না তোর মতিগতি
রং বাহারি ডানায় দোলে
ঘুমিয়ে পড়িস ফুলের কোলে।
আমার চোখে ঘুম আসে না
লেখাপড়ায় মন বসে না
হইবা যদি প্রজাপতি
আমায় দিবি উড়ার গতি?
উড়তে উড়তে তেপান্তরে
মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে
অনেক দূরে পরির দেশে
যাচ্ছে উড়ে দিনের শেষে।

ভুল করি জয়

বাসুদেব খাস্তগীর

ভুল করে করে আমি তো শিখেছি
ভুলকে ভাবি না পর
ভুলকে আপন করেই আমি তো
শুদ্ধে বাঁধি যে ঘর।
ভুল ছিল বলে হইনি হতাশ
বিরাগ হয়নি মন
অনুরাগে আমি ভুলকে দিয়েছি
কত না বিসর্জন।
তবু এসে ভুল কিলবিল করে
দুয়ারে দেয় যে হানা
কখনো তা বুঝি কখনো বুঝি না
কখনো হয় না জানা।
ভুলের মাঝেই শুদ্ধের ঘর
হোক না যতই ভুল
আমি তো ফোটাই ভুলেরই মাঝে
শুদ্ধের যত ফুল।
ভুলের উপর পাঠশালা গড়ে
আমি নিই তার পাঠ
আমার কাছে যে ভুল যেন এক
ঋদ্ধ হবার মাঠ।
ভুলকে কখনো করি নাকো ভয়
ভুল হয় হোক যদি
ভুলকেই জয় করে বলি আমি
লিখে যাই নিরবধি।

পড়ার কথা

মো. রিমন হোসাইন

পড়ার কথা বললে আমার
গায়ে আসে জ্বর,
শিক্ষক পড়া ধরেন যদি
বুক করে ধরফর।
সকালবেলা আব্বু বকেন
বিকেলবেলা ভাই,
রাত্রি হলে তখন আবার
দাদুর বকা খাই।
আজ থেকে তাই পণ করেছি
পড়ব যতন করে,
দেখে যেন সক্কলেরই
খুশিতে মন ভরে।

দশম শ্রেণি, নাদুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পাংশা, রাজবাড়ী

মন লাগিয়ে পড়ো

শামসুল করীম খোকন

পড়তে বসে বইয়ের দিকে
মন লাগাতে হয়
তাহলেই হয় যে পড়া
নইলে মোটে নয়।
মনটা যদি অন্যদিকে
ঝুঁকেই একটু পড়ে
নড়েচড়ে দৃষ্টি দিও
আবার বইটা ধরে।
পড়তে গিয়ে ঝিমাও যদি
একটু হেঁটে আসো
চোখে পানির ছিটা দিয়ে
ঘুমের আবেশ নাশো।
লিখে লিখে শিখে নিও
তোমার ক্লাসের পড়া
সব জড়তা দূর করেই
লাগবে জীবন গড়া।
পড়ার চেয়ে খাতায় যারা
বেশি করে লেখে
নির্ভুল যে হয় বানান
পড়াও দ্রুত শেখে।
ঝকঝকে, তকতকে তার
হাতের লেখা হয়
পরীক্ষারও হলে কাটে
মনের সকল ভয়।
এভাবেই পড়ে পড়ে
সফল হতে হবে
লেখাপড়ায় জগৎ জোড়া
খ্যাতি পাবে সবে।

প্রথম পর্ব

রহস্যময় স্থাপত্য

খালিদ বিন আনিস

মানবজাতির অতীত জানতে ইতিহাসের গবেষকদের চেষ্টার শেষ নেই। প্রাচীন সব স্থাপনা, লোকগাথা আর যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কাহিনি গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা পাচ্ছেন নতুন নতুন সব তথ্য। তবে হাজার হাজার বছর আগের মানবসভ্যতার অনেক বিষয়ই এখনো মানুষের অজানা। সেসব নিয়ে যেমন রহস্য রয়েছে, তেমন রয়েছে নানা উপকথাও। যা রহস্যের মাত্রা শুধু বাড়িয়েছেই!

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু স্থাপনা রয়েছে যা নিয়ে এক পক্ষ দাবি করে যে তা এই পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়! বিজ্ঞানীরা সেসব স্থাপনা ভিনগ্রহীদের নয় দাবি করলেও সেগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও আঁধারে! এমনই কিছু স্থাপনা নিয়ে এবারের ধারাবাহিক আয়োজন।

কৈলাশ মন্দির

কালাচুরির শাসনামলে কৈলাশনাথ মন্দির স্থাপিত হয় বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। ইলোরার সবগুলো স্থাপনার কেন্দ্রে অবস্থিত এই বহুতল মন্দিরটি আজো হালের বিজ্ঞানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আসছে। একটি মাত্র পাহাড়কে নিখুঁতভাবে কেটে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যা নাকি উপর থেকে কেটে নিচে নামিয়ে আনা হয়।

এথেন্সের পার্থেননের চাইতেও দ্বিগুণ আকৃতির এই মন্দিরটির সঙ্গে কৈলাশ পর্বতের যোগ রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যে পর্বতে শিবের বাসস্থান বলে জানেন। কৈলাশ পর্বতের সঙ্গে মিল বজায় রেখেই এটিতে তাই সাদা আস্তর দেওয়া হয়েছিল।

গুহা মন্দিরে হিন্দু ধর্মের বহু দেবতা এবং পৌরাণিক মূর্তি খোদাই করা আছে। মন্দিরটির মধ্যে থাকা উন্মুক্ত মণ্ডপে পাথর কেটে বিশাল আকারের হাতি এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। প্রায় দু'লাখ টন ওজনের পাহাড় কেটে ২৯ মিটার লম্বা এবং ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের কৈলাশ মন্দির তৈরি করতে শতাধিক বছর সময় লাগে বলে ঐতিহাসিকেরা দাবি করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানই আবার বলছে হাজার হাজার বছর আগে শুধু হাতুরি আর ছেনি দিয়ে এসব স্থাপনা নির্মাণ করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

ইলোরা

ভারতের মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু রহস্যময় স্থাপনা। রাজ্যের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে গ্রানাইট পাথরের বিশাল পাহাড় কেটে এসব স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। কথিত আছে রাষ্ট্রকূট রাজবংশ এগুলো নির্মাণ করেন। অবশ্য এর সঙ্গে চালুক্য ও কালাচুরি রাজবংশের নামও

রয়েছে জড়িয়ে। ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত স্থানটিতে প্রতিবছর অসংখ্য পর্যটক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। পাহাড় কেটে বানানো ইলোরায় মোট ৩৪টি গুহা রয়েছে। এরমধ্যে ১৭টি হিন্দু, ১২টি বৌদ্ধ এবং ৫টি জৈন ধর্মের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু স্থাপনা রয়েছে যা নিয়ে এক পক্ষ দাবি করে যে তা এই পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়!

এলিয়েন বিশ্বাসীদের দাবি, এসব স্থাপনার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে ভিনগ্রহীদের উন্নত প্রযুক্তির উদাহরণ। হাজার হাজার বছর আগে মানবসভ্যতাকে আধুনিক করতে যারা এই অঞ্চলে এসেছিল। কোনো কোনো এলিয়েন বা ভিনগ্রহীদের সম্পর্কে বিশ্বাসীরা যাকে 'আনুনাকি' নামে ডেকে থাকেন। যাদের পদচারণা নাকি মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার কোলঘেঁষা মিশরেও ছিল।

অজন্তা গুহা মন্দির

ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার পূর্বে অজন্তা গুহামন্দিরের অবস্থান। হাজার হাজার বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা গুহাটি ১৮১৯ সালে আবিষ্কার হলে গবেষকরা অবাক হয়ে যান। জন স্মিথ নামের এক বাঘ শিকারি অনেকটা দুর্ঘটনাবশতই এই গুহাগুলো আবিষ্কার করে ফেলেন।

আওরঙ্গবাদ জেলার জলগাঁও রেলস্টেশনের কাছে, অজন্তা গ্রামের পাশেই এসব গুহার অবস্থান। ইলোরা থেকে প্রায় ১০৮ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গভীর খাড়া গিরিখাতের পাথর কেটে খোদাই করে তৈরি এই গুহাগুলো আজও এক অমীমাংসিত রহস্য হয়েই রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রায় ৩০টি গুহাস্তম্ভ যা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ করা হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

অবশ্য ইলোরার কৈলাশ মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিদর্শন ছড়িয়ে থাকলেও অজন্তায় রয়েছে শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন। কিন্তু কারা এটি নির্মাণ করেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গবেষকদের দাবি, সেখানকার ভিল জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই সম্ভবত এগুলো নির্মাণ করেন। কেননা ভিল জনগোষ্ঠী যে ধরনের শিল্পকর্মে অভ্যস্ত ছিল সেই একই চিত্রকলার নিদর্শন অজন্তার বিভিন্ন গুহাতেও ছড়িয়ে রয়েছে। অন্য পক্ষের অবশ্য দাবি হচ্ছে, ৪৬০ থেকে ৪৮০ খ্রিষ্টাব্দকালে ভারতের ভক্তক রাজবংশের সম্রাট হরিসেনা ২৩টি গুহা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে এমন বিস্ময়কর গুহা নির্মাণ করা হয়েছিল তা আজও এক রহস্য।

অবশ্য এলিয়েন বিশ্বাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই এই স্থাপত্যগুলোর পেছনে ভিনগ্রহীদের হাত রয়েছে বলে দাবি করে আসছেন। কেননা যে প্রযুক্তিতে এসব স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়, সে সম্পর্কে পরবর্তীতে কোনো সূত্র মেলেনি। যারা এগুলো নির্মাণ করেছিল, পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কেও ইতিহাসে কোনো তথ্য নেই।

তাদের আরো দাবি, এসব স্থাপত্য সম্পূর্ণ হাতে তৈরি বলা হলেও সেই আমলে এসব পাথর নিখুঁত করে কাটার কোনো আধুনিক প্রযুক্তি তাদের কাছে ছিল না। আর যদি থেকেই থাকে, তবে সেসব প্রযুক্তির পেছনে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অবদান থাকাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ

চান মিয়া চান্দু

নদীগুলো আঁকাবাঁকা
পাখিগুলো চেনা,
বাংলাদেশ দেশের নাম
দেখে মুগ্ধ কে না?
গ্রামগুলো গাছে ঘেরা
গাছে সবুজ পাতা
দূর থেকে মনে হয়
সবুজ সবুজ ছাতা।
বিলগুলো বকের মেলা
জলে শাপলা ফুল,
জোনাক জ্বলে রাতেরবেলা
গুণলে হয় ভুল।
ছায়াঘেরা প্রতি গ্রামে
আছে ডোবা পুকুর,
সাঁতার কেটে মনে সুখ
নাচে খোকা খুকুর।
দেশের ছবি খোকাখুকু
আঁকে তাদের খাতায়,
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
সবুজ কচুর পাতায়।

মানব

সৈকত সমীর সুহৃদ

বিশ্বজুড়ে একই জাতি
আছে তাদের মান
নাইকো তফাত তাদের মাঝে
সবার আছে প্রাণ।

রক্ত আছে সবার দেহে
সবার ব্যথা আছে
নাই যে কারো রঙের তফাত
সুখও সবার কাছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, উত্তরা, ঢাকা

গল্প

ছয় ফুট মশা

স.ম. শামসুল আলম

ছয় ফুট মশা এখন মশারির তলে। খবরটি শুনে হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা। সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম স্কুল ছুটির পর আমরা মশাকে দেখতে যাব।

এই মশা কিন্তু রক্ত খাওয়া মশা নয়। আমাদের সহপাঠী মশা। মানে মশাররফ হোসেন। মশাররফকে সংক্ষেপে মশা ডাকি। ওর মা-বাবাও এই নামে ডাকেন। মশার উচ্চতা ৬ ফুট। বয়সে আমার থেকে ৩ বছরের বড়ো। আমরা সবেমাত্র হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। পিএসসি-তে আমি জিপিএ-৫ পেলেও মশা পায়নি। এ নিয়ে ওর কোনো আক্ষেপও নেই। মশা বলে মার্কস পাওয়া বড়ো কথা নয়– শেখাটাই আসল, জানাটাই আসল।

তো এই মশা অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছে। কয়েকদিন স্কুলে আসে না। আজ খবর পাওয়া গেল ও অসুস্থ। চিকেনপক্স নাকি চিকুনগুনিয়া হয়েছে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ওকে মশারির তলে থাকতে হচ্ছে।

মশা কেন মশারির তলে? বিষয়টি নিয়ে সকলের কৌতূহলের শেষ নেই। একে তো বয়সের তুলনায় অনেক লম্বা হওয়ায় সকলের থেকে আলাদা। তার ওপরে নামটাও হাসির খোরাক জোগায়।

মশাকে নিয়ে আমাদের হিংসারও শেষ নেই। খেলার মাঠে নামলে ওর সাথে কে পারবে? ফুটবল খেলায় আমি খুব ভালো খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিতি পেলেও মশা আমার শত্রু। কারণ মাঝে মাঝে হেরে যাই মশার কারণে। অনেক লম্বা হওয়ার কারণে ওর সাথে দৌড়ে পারি না। বল ওর পায়ে গেলে কেড়ে নিতে পারি না। মনে হয় ও মেসি আর আমি মেসির পিচ্চি ছেলে। ওর মাজা সমান আমার উচ্চতা। কী আর করা– অগত্যা হার মেনে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

একবার হাডুডু খেলার সময় এমন বিপদে পড়লাম, বলার নয়। আমি দম ধরে ডু দিয়ে ওদের কোর্টে

যেতেই এক ফাঁকে খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল মশা। এমনকি ও দুটি হাতও কাজে লাগায়নি। একটি হাত দিয়ে আমার ডানা এমনভাবে ধরেছে যে আমি শত চেষ্টা করেও ছুটতে পারলাম না। কয়েকবার ঝাঁকি মেরে ছোটার চেষ্টা করলাম এবং একবার দমও চুরি করলাম ঝাঁকি মারতে গিয়ে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যারা খেলা দেখছিল তারা মজা পেয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে থাকল। আমি লজ্জায় লাল। হিংসায় জ্বলতে থাকি।

মশার সাথে দৌড়িয়ে পারি না, সাঁতরে পারি না, ফুটবলে পারি না, হাডুডুতে পারি না। সুতরাং হিংসা তো হবেই। তবে একবার পারলাম। গত স্বাধীনতা দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানের প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হলাম আর ও তৃতীয়। আমি গেয়েছিলাম 'এই যে আমার বাংলাদেশের গল্প শুনে যাও' গানটি, আর ও গেয়েছিল 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়'। পুরস্কার হাতে নেওয়ার পর মশা-ই আমাকে প্রথমে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তখন বুঝলাম ওর মনে কোনো হিংসা নেই।

আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল ২ কিলোমিটার দূরে। ১ কি.মি. পর মল্লিক পাড়া। সেখানে একটি তেমাথা। স্কুল থেকে ফেরার পথে এই তেমাথা থেকে মশা আলাদা হয়ে যায়। আমি ডান দিকে আর ও বাঁদিকে। ওদের বাড়িও তেমাথা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে। আগে রাস্তা কাঁচা ছিল, এখন পাকা। আমরা ভ্যানে চড়ে বা ইজিবাইকে চড়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করি।

একদিন মশাকে বললাম কাঁচামিঠে আম খাব। মল্লিক পাড়ায় মল্লিকদের একটি বড়ো আমবাগান আছে রাস্তার পাশে। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমরা ৫/৬ জন আমবাগানে ঢুকলাম। নেতৃত্ব দিল মশা। চুরি করে আম পাড়ার মজাই আলাদা। গাছে কে উঠবে তা নিয়ে কথা হলো। কেউ রাজি নয়। কারণ ধরা পড়লে বিপদ আছে। নিচ থেকে সবাই দৌড়ে পালাতে পারলেও গাছে যে উঠবে সে পালাতে পারবে না। মশা বলল, দেখি গাছে না উঠে আম পাড়তে পারি কি না।

আমাদের মনেই ছিল না মশা ছয় ফুট লম্বা। মশা লাফ দিয়ে গাছের একটি ডাল ধরে নোয়ায়ে ফেলল। এক হাতে ডাল ধরে অন্য হাতে আম পাড়তে লাগল। সেই আম খাওয়ার কথা কখনো ভুলতে পারি না। আর সেই আম পাড়া মশা অসুস্থ। সুতরাং দেখতে যাওয়া জরুরি।

স্কুল ছুটির পর আমরা কয়েকজন ছাত্র ভ্যানে করে মশাদের বাড়ি গেলাম। দেখি সত্যি সত্যি মশা ঘরের বারান্দায় শুয়ে আছে মশারির তলে। উঠোনে গিয়ে ওকে ওভাবে দেখেই আমরা হেসে ফেললাম। মশা আমাদের দেখে একটু খুশি হলো বলে মনে হলো। মৃদু হেসে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। আমাদেরকে কাছে ডাকল। আমি বললাম, তুমি চিন্তা কোরো না। শীঘ্রই সেরে উঠবে।

মশা একটু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, কিন্তু আমার মনে হয় আমি আর বাঁচব না রে। শরীর অনেক দুর্বল লাগে।

জারিফ বলল, এভাবে বলতে নেই। অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

মশাকে দেখে বাড়ি আসার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত চঞ্চল আর শক্তিশালী মশা কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। শুনেছি ডাক্তার নাকি ওর রোগ ধরতে পারছে না। রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আজকাল স্কুলে গিয়েও আমার মনটা খারাপ থাকে। মশার অনুপস্থিতিতে সকল আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। সবারই মন খারাপ। শিক্ষকরাও মশাকে নিয়ে মজা করতেন। এখন তারাও প্রতিদিন ওর খোঁজখবর রাখতে ব্যস্ত।

জানা গেল রাজবাড়ীর ডাক্তারও নাকি ওর রোগ ধরতে পারেনি। মশাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আমরা চিন্তিত।

মাস খানেক পর মশার মৃত্যুসংবাদ পেলাম। বুক ফেটে কান্না এল বন্ধুর জন্য। যে বন্ধুটি গান গেয়েছিল 'একবার যেতে দে না আমায় ছোট্ট সোনার গাঁয়', সেই বন্ধুটি কি তাহলে নতুন কোনো সোনার গাঁয়ে চলে গেল? কেন? আমাদের ছোট্ট সোনার গাঁয়ে থাকলে ওর কী ক্ষতি হতো?

যে মশাকে নিয়ে আমি হিংসা করতাম সেই মশা আজ এত প্রিয় হয়ে উঠল কেন বুঝতে পারলাম না। শুনলাম বয়সের তুলনায় ওর শরীর বেড়ে গিয়েছিল বেশি। এটাও এক ধরনের রোগ। তাহলে এমন রোগ ওর

হলো কেন? শরীর না বাড়লে কী ক্ষতি ছিল? ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। না হয় আমি ওকেই জিততে দিতাম। আমি না হয় হেরেই যেতাম। তবু বেঁচে থাকল না কেন? তবে কি আমি ওকে ভালোবাসতাম?

স্কুলে শোকসভা। সকলের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ততা। দোয়া করা হবে মশার জন্য। মসজিদের ইমাম সাহেব এসেছেন। সকল শিক্ষক উপস্থিত আছেন। আমি সবার পিছনে বসা। হেডস্যার দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রিয় ছাত্র মশাররফের আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য। সে আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার অনেক স্মৃতি আছে। সে যদি তোমাদের কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকে, তোমরা নিজ গুণে তাকে ক্ষমা করে দিও। কোনো দেনা-পাওনা থাকলে আমাকে জানিও।

আমি উঠে দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু কে যেন আমার সে শক্তি কেড়ে নিয়েছে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তার কাছে আমার হিংসা পাওনা আছে। আমি তাকে অনেক হিংসা করতাম। এই হিংসাগুলো আমি ফেরত চাই।

আমার চোখ ফেটে জল ঝরতে থাকল। যেন দুটি ঝরনাধারা। আমি বুঝিনি হিংসা করা ভালো নয়। তুমি কী আমার হিংসা সহ্য করতে না পেরে চলে গেলে? তুমি বিশ্বাস করো মশা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

মা এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। বললেন, এভাবে ছটফট করছিস কেন? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস?

হয়ত মশাকে নিয়ে এতদিন আমি খুব ভেবেছি বলেই এমন একটি দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

স্কুলে গিয়ে খবর পেলাম মশা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শুনেছি ওর শরীর নাকি এখনো খুব দুর্বল। বিশ্রামে থাকতে হবে আরো কিছুদিন।

মশাদের বাড়ি গিয়ে মশাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, জানি তোর মনে হিংসে নেই। কিন্তু আমার আছে। তোকে আমি অনেক হিংসে করি। এরপর আরো বেশি হিংসে করব।

মশাকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য লাফ দিয়ে ওর গলা ধরে নুয়ে পড়লাম। সাথে আসা বন্ধুরা সবাই তখন হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার জোগাড়।

গল্প

অ্যানির চড়ুইবন্ধু

শাম্মী তুলতুল

পড়তে বসে অনেকক্ষণ ধরে অ্যানি কীসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না শব্দটি কোথা হতে আসছে। একটু পর পর শব্দটা কানে বাজছিল। অনেক চেষ্টা করেও আর পড়ায় মনোযোগ দিতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত বই বন্ধ করে পড়ার টেবিল থেকে উঠে গেল অ্যানি। দরজা ঘেঁষে দাঁড়াতেই টের পেল শব্দটা বাইরে থেকে আসছিল। এবার মনে হলো কোনো পাখির কিচিরমিচির শব্দ। অ্যানি তড়িঘড়ি করে দরজা খুলল, নিশ্চিত হলো শব্দটি ছাদের সিঁড়িঘর থেকেই আসছিল।

ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই নজর পড়ল সিঁড়ির এক কর্নারে ঝোপের ভেতর তুলতুলে, ছোটো ফুটফুটে দুটো পাখি। ছানা দুটোই কিচমিচ - কিচমিচ শব্দ করছে। খড় দিয়ে বানানো বাসা থেকে একবার বেরুচ্ছে আবার ঢুকছে।

অ্যানি তো দেখে অবাক। ওমা! কী আদুরে পাখি। কত সুন্দর করে খেলছে। অ্যানি চোখ বড়ো বড়ো করে গালে হাত দিয়ে তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু পাখি দুটো অ্যানিকে দেখে ভয় পেয়ে লুকোতে লাগল। খেলা করা বন্ধ করে দিলো।

অ্যানি তখন তাদের হাত নেড়ে ইশারায় বলে, ওরে ছানারা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো। কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না। আমিও না। আজ থেকে আমি তোমাদের বন্ধু।

বোঝার ভান করে ছানাগুলো অ্যানির দিকে তাকিয়ে আবার ঝোপে ঢুকে গেল।

একা একা কথা বলতে দেখে পেছন থেকে মা বলে, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিসরে মা ?

অ্যানি অতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দেখো মা কী সুন্দর দুটো পাখি।

চড়ুই পাখি?

এই পাখিদের নাম চড়ুই পাখি বুঝি?

হ্যাঁ। আজ সকাল থেকেই এদের এখানে দেখতে পাচ্ছি। তখন থেকেই শব্দ করছে। মনে হয় আজ ভোরে ভোরে এখানে বাসা বেঁধেছে।

অ্যানি তাদের পেয়ে মহাখুশি। পড়ালেখার পাশাপাশি এখন তার নতুন কাজ বন্ধুদের সাথে চুপচুপি, ফিসফিস করে কথা বলা। গল্প করা। হাসাহাসি করা। আড্ডা দেওয়া।

তারাও এই কয়দিনে বেশ বুঝতে পেরেছে অ্যানি দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তাকে দেখলে এখন আর ভয় পেয়ে ঝোপের ভেতরও ঢুকে যায় না। মাথা নাড়ে। অ্যানির হাতে উড়ে এসে বসে। মাথায় বসে, কোলে বসে। কত্ত মজা করে। ওরা যখন বাইরে যায় অ্যানিও ওদের জন্য অপেক্ষা করে।

এভাবে চড়ুই বন্ধুদের নিয়ে অ্যানির ভালোই দিন কাটছিল। এদিকে সামনে অ্যানির জন্মদিন। তাই ঘরদোর পরিষ্কার করা শুরু করে দিলো মা।

একদিন অ্যানি স্কুল থেকে এসে দেখে মা আর রহিমা নানু ঘর পরিষ্কার করছে। অ্যানি সেদিকে অত মন না দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা খেয়ে বন্ধুদের সাথে খেলতে গেল। গিয়ে দেখে পাখিগুলো নেই। তাদের বাসাও নেই। ওমনিই অ্যানির মুখ কালো হয়ে গেল। চিন্তায় পড়ে গেল। অ্যানি পাগলের মতো এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। ছাদের চারপাশে দেখল। কিন্তু নাহ, কোথাও নেই তার চড়ুইবন্ধু।

বন্ধুদের না পেয়ে অ্যানি কাঁদো কাঁদো হয়ে মায়ের কাছে ছুটে এসে বলে, মা মা আমার চড়ুই বন্ধুরা নেই।

কই যাবে ওখানেই তো ছিল।

ওখানে নেই মা।

মেয়ের অবস্থা দেখে মাও তখন খুঁজতে শুরু করে দিলেন।

নিচ থেকে রহিমা খালা উঠতে উঠতে বলে, ওই ফাখি দুইডারে নিচে গেইটের সামনে থুইয়া আইছি। সারাদিন কিচিরকিচির। কান দুইডা দরদ কইরা ওডে।

সর্বনাশ, একি করলে খালা? শিগগিরই যাও। তোমার অ্যানি বুড়ি পাখি দুটো খুঁজে খুঁজে হয়রান। না পেলে এবার জন্মদিন মাটি হয়ে যাবে।

অ্যানি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, আমার পাখি দুটোকে এক্ষুনি এনে দাও নানু। ওরা আমার বন্ধু। ওরা কি আমাদের কোনো ক্ষতি করেছে? নাকি তোমার কোনো ক্ষতি করেছে? বলো তো, তোমার বুঝি একটুও মায়া হলো না পাখি দুটোর জন্য? স্কুলে স্যার বলছেনে পশু-পাখিদের তুমি বিরক্ত না করলে ওরা কখনো তোমাকে নিজ থেকে বিরক্ত করবে না। ক্ষতি করবে না। একবার ভেবে দেখো কাজটা কী তুমি ভালো করলে?

অ্যানির কথা শুনে রহিমা খালা খুব লজ্জা পেলো। মাথা নিচু করে আবার তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। এক সেকেন্ডের ভেতরে পাখিগুলো অ্যানির দুহাতে দিয়ে বলল, আমার ভুল হইয়া গেছে আফামনি। এমন ভুল আর কোনোদিন হইব না।

পাখি দুটোকে পেয়ে অ্যানি খুশিতে আত্মহারা। ওর মেঘ করা মুখ আলোকিত হয়ে গেল। খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসতেই লাগল। আর ওর বন্ধুরা কী বলল জানো?

কিচিরমিচির! কিচিরমিচির!

খোলা হাওয়া

শম্পা প্রদীপ্তি

তাযী...তাযী...!

মা কেন ডাকছ এত? আর আমাকে তুমি তাযী...তাযী বলছ কেন? আমার নাম তাযীম; দাদু বলেছে পুরো নাম ধরেই সব সময় ডাকতে হয়!

অহহ! আমার দাদুর নাতিরে...ঠিক আছে বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে, তো এবার আমার কথাটা শোনো।

হ্যাঁ বলো, কী বলবে...।

তুমি এত শব্দ করে খেলছ কেন? নিচের ফ্ল্যাট থেকে তো কমপ্লেইন আসবে এখনই।

কমপ্লেইন কেন আসবে? আমি তো একা একা আমাদের বাসায় খেলছি।

কিন্তু তুমি যে উপরে শব্দ করছ, এই শব্দটা নিচে যাচ্ছে আর সেজন্য তাদের ডিসটার্ব হচ্ছে; তাই তারা বলতে আসবে, আমরা যেন শব্দ না করি। তুমি তো ভালো বেবি আমার, তাই না? শব্দ না করে চুপচাপ খেলো সোনা।

আমি আমাদের বাসায়ও শব্দ করতে পারব না? অন্যদের বাসায় বেড়াতে গেলে বলো, চুপচাপ বসে থাকো, উদ্যানে বেড়াতে গেলে বলো, আমার কাছাকাছি এখানেই খেলো, ওদিকে যেও না! মা, বাপি এলে আমি বলব, আমি নিচের বাসায় থাকব, তাহলে আমি শব্দ করলেও আর কোনো কমপ্লেইন আসবে না।

হা হা হা ঠিক আছে, বাপি এলে আমরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলব, এবার তুমি নিজের মতো করে চুপচাপ খেলো, আমি হাতের কাজটা সেরে নেই।

মা, দাদু আমাদের বাসায় থাকে না কেন? দাদু আমার বন্ধু, সে আমাদের বাসায় থাকলে আমি দাদুর সাথে ঘোড়া ঘোড়া খেলতাম, দাদুর সাথে খেতাম। তুমি স্কুলে থাকার সময় মরি আপু রান্নাঘরের কাজ করে, আবার আমাকে খাইয়ে দেয়। তুমি তো বলো, হাত সব সময় পরিষ্কার করে খেতে হয়? আমি মরি আপুকে বলি, আমার কথা শোনে না, আমাকে রাগ করে বলে, 'খেয়ে নাও! আমার আরো কাজ আছে!' মা, তুমি দাদুকে নিয়ে এসো।

দাদুর যে গ্রামে একটা বড়ো বাড়ি আছে, সেটা তাকে দেখাশোনা করতে হয়, তাই আমাদের সাথে থাকে না।

না! দাদু আমাকে বলেছে, দাদুর ঐ বাড়িতে একা একা থাকতে ভালো লাগে না, ভয় পায়; তাই তো আমাকে ফোনে বলল, 'দাদু ভাই, আমি তো ভয় পাই, তুমি তো সাহসী ছেলে, তুমি আমার কাছে চলে এসো, তাহলে আর আমি ভয় পাবো না।' মা, চলো আমি দাদুর কাছে যাব।

চলো বললেই তো যাওয়া যায় না বাবা, বাপির অফিস আছে, আমার স্কুল আছে, আর তোমাকেও তো এখন পড়শোনা করতে হবে, এবার তো তুমি স্কুলে ভর্তি হবে, তাই না?

মা, আমি তোমার স্কুলে ভর্তি হবো? মা, তুমি আমি বাপি তাহলে আমরা সবাই কাজ করব একসাথে? কেউ বাসায় থাকব না?

হা হা হা বোকা ছেলে...। তোমার বাপি আর আমি কাজ করব কিন্তু তুমি পড়াশোনা করবে।

কেন মা, পড়াশোনা করা কাজ করা নয় কেন? আমি তো এখনো কাজ করছি, আমার মোটর গাড়ি, বল তুলে রাখছি। ছোটো মামা তো বলে, 'তাযীম তুই খুব কাজের ছেলেরে বাপ, আয় তো আমার কাছে, মাথাটা একটু টিপে দে।'

ঠিক আছে বাবা তুমি খুব কাজের ছেলে, আর সেজন্যই আমি জানি তুমি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করবে।

মা, আমি কী একা একা পড়াশোনা করব, চুপচাপ করে?

কেন, তুমি একা একা পড়াশোনা করবে কেন? আমি তোমাকে পড়াব। আর পড়ার সময় জোরে জোরে পড়তে হয়, তাহলে পড়াটা মনে থাকে।

কেন জোরে পড়ব? তাহলে যদি নিচের ফ্ল্যাটের আন্টি কমপ্লেইন নিয়ে আসে, তাযীম, তুমি এত চিৎকার করছ কেন? তখন?

না, পড়াশোনা করলে কেউ কিছু বলে না।

চিৎকার করে পড়লেও না? শুধু খেলতে শব্দ হলে কমপ্লেইন করে?

উহ্, এত প্রশ্ন করছ কেন? যাও নিজের মতো থাকো, আমাকে একটু কাজ করতে দাও।

মা, তুমি সকালে স্কুলে কাজ করে এলে, এখন আবার কাজ করছ, এত কাজ করলে আমাকে পড়াবে কখন?

সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না! আমি ম্যানেজ করে নিবো বাবা...।

তুমি যেভাবে টাইম ম্যানেজ করে আমাকে শিশুপার্কে নিয়ে যাও?

হ্যাঁ সেভাবে, এবার তুমি যাবে? আমাকে স্কুলের খাতাগুলো দেখতে দিবে? নাকি না! যাও এখান থেকে...!

মা, আমি বারান্দায় যাব?

হ্যাঁ যাও, কিন্তু নিচের মাঠের ঐ ছেলেগুলোর সাথে কথা বলবে না!

তাহলে আমি একা একা চুপচাপ গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকব? মা, আকাশে কয়টা পাখি যায় আমি তোমাকে গুণে গুণে বলি? এখন তো বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখনই তো ওরা ওদের বাসায় ফিরবে ঐ আকাশ দিয়ে উড়ে উড়ে, তাই না মা?

আমি জানি না; তুমি যা খুশি করো! কেন মা, তুমি জানো না, পাখি কখন বাসায় ফিরে? দাদু আমাকে বলেছে, পাখিরা বিকেলের শেষে, সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরে। মা, তুমি কিছুই জানো না।

হ্যাঁ, আমি কিছু জানি না! আর কিছু জানতেও চাই না, তোমার দাদু সব জানে, তুমি তাকে ফোন করে আরো জেনে নাও, ঠিক আছে, এবার যাও!

তাযীমের খুব মন খারাপ হয়ে যায়, সে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশটা দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে; পাখিটিকে উড়তে দেখে তার খুব ইচ্ছে হয় পাখি হয়ে উড়ে যেতে। ইস! পাখিদের কী মজা! তারা ইচ্ছেমতো আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাদের কেউ বকা দেয় না। আবার তার নিচের মাঠের দিকে চোখ চলে যায়। মাঠের ছেলেদের ছুটোছুটি দেখে তার খুব ইচ্ছে হয় ওদের কাছে যেতে। তাযীম মনে মনে ভাবে, ইশ! ওরা কত মজা করছে, ইচ্ছেমতো খেলছে, ইচ্ছেমতো চিৎকার করছে, ছুটছে... ওদের মা, বাপিও কত ভালো, ওদেরকে ডাকছে না, মানা করছে না মাঠে খেলতে। আমার মা, বাপিও ভালো, আমাকে কত কত খেলনা কিনে দেয়, মজার মজার খাবার এনে দেয়। তবুও ওদের যেন বেশি মজা।

এই ছেলে, ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? খেলবি? আয়... নিচে নেমে আয়।

নিচ থেকে তাযীমের থেকে একটু বড়ো একটা ছেলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

না যাব না এখন।

কেন, খেলবি না আমাদের সাথে?

খেলব তো, তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে খেলতে নিবে?

হ্যাঁ নিব, নিচে নেমে আয়।

তুমি আমার বন্ধু হবে? বন্ধু না হলে তোমার সাথে কেমন করে খেলব?

হ্যাঁ বন্ধুও হবো, আয় খেলতে আয়।

না, এখন যাব না, মা বকবে, কাল যাব। তোমরা কী সকালেও খেলো?

হ্যাঁ খেলি, আমাদের ইচ্ছে হলেই আমরা খেলি। কাজ করতে করতেও খেলি।

আমি তাহলে কাল সকালে তোমাদের সাথে খেলতে যাব।

কাল সকালে আসিস না, দু-দিন হলো কাগজ কুড়াতে বের হই না, কালকে কুড়াতে যাব, তুই বিকেলে আসিস, এ সময়।

বিকেলে? তাযীম চিন্তায় পড়ে গেল, মা থাকে তখন বাসায়।

তাযীম কার সাথে কথা বলছ?

বলছি না মা।

আমি যে কথা শুনছি, মিথ্যে কথা বলছ কেন?

বলছি না মা।

তুমি এদিকে এসো।

তাযীম ভয়ে ভয়ে গুটিগুটি পায়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

তুমি আবার সেই বস্তির বাচ্চাগুলোর সাথে কথা বলছিলে, তাই না? ওরা ময়লা-নোংরার মধ্যে থাকে, নোংরা ভাষায় কথা বলে, তাই আমি তোমাকে বলেছি তুমি ওদের সাথে কথা বলবে না!

কিন্তু মা ওরা তো আমার সাথে নোংরা কথা বলেনি, আমাকে শুধু বলেছে, খেলবি? তবে নিচে আয়।

কী? তোমাকে তুই তুই করে বলেছে ঐ বস্তির বাচ্চাগুলো? এই জন্যই বলি তুমি বারান্দায় যাবে না! আমার কথা একটাও শোনো না! এই বাসা আমাকে বদল করতেই হবে, আজ আসুক তোমার বাপি।

ঐ ছেলেটা আমাকে তুই বলাতে তুমি রাগ করছ কেন মা? ছোটো মামা তো আমাকে তুই করে বলে। তুমিও তো কখনো কখনো বলো। আর মরি আপুওতো যখন আমাকে খাইয়ে দেয়, বলে খা আমার সোনা...।

মানে? দাঁড়াও, এই কাজের মেয়েটাই যত নষ্টের মূল, সে মনে হয় শেখাচ্ছে তোমাকে এসব! তাই না?

মা তুমি মরি আপুকে বোকো না, সে-তো আমাকে খুব আদর করে, তাই তুই বলে কখনো। মা ঐ ছেলেটাও তো আমার বন্ধু হতে চায়, তাই তো আমাকে তুই বলে, খেলতে ডাকে। আমি কি কাল যাবো মা ওদের সাথে খেলতে?

মা কিছুই বলে না। কিছুই না।

তাযীম কোনো কথা না বলে চুপচাপ মায়ের সামনে থেকে চলে যায়। টিভি ছেড়ে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন দেখতে থাকে। কার্টুন দেখতে দেখতে এক সময় সব ভুলে সে আপন মনে খিলখিল করে হেসে উঠে টম অ্যান্ড জেরি'র কাণ্ড দেখে। একটু পর ওর আর কিছুই করার থাকে না। কোন ফাঁকে আবারো বারান্দায় যায়। গ্রিল ধরে নিচে তাকায়। ঐ যে নিচে খোলা মাঠ, উপরে খোলা আকাশ, দেখতে থাকে... দেখতে থাকে...

একটু পর। মা ডেকে ওঠেন, তাযীম!!

মা!

চলো তুমি আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে মা?

চলোই না, সারপ্রাইজ!

সারপ্রাইজ? চলো ... চলো ...।

মা তাযীমকে নিয়ে নিচের ঐ ছোট্ট মাঠটিতে যায়, চতুর্দিকের বাড়ির মাঝে কী করে যেন এই জায়গাটুকু ফাঁকা পড়ে আছে।

এই তোমরা তাযীমকে খেলতে নিবে?

মাঠের ছেলেগুলো খেলা বন্ধ করে জড়সড় হয়ে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

তাযীম মার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসি দিয়ে বলে, মা তুমি খুব ভালো...। এই বলে আর দাঁড়িয়ে না থেকে দেয় ওদের কাছে এক ছুট...। এই... আমি এসেছি বন্ধু, তুমি না আমাকে খেলতে নিবে বলেছিলে?

ওরা খেলতে থাকে, মা মাঠের এক কোণে বসে আপন মনে বলে ওঠে, বাহ! ভালোই তো, বিকেলের এই সময়টা এই খোলা হাওয়ায় আমারও একটু চমৎকার কাটবে...।

নিবন্ধ

একজন মহান মানুষের গল্প

মমতাজ খান

ছোটোবেলা থেকেই ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র দশ বছর বয়সে সে পবিত্র কোরান মুখস্ত করে।

ছেলেটির জন্ম ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। বোখারার আভসেনা শহরে। বোখারার আভসেনা শহর উজবেকিস্তানের অন্তর্গত। ছেলেটির বাবার নাম আবদুল্লা এবং মায়ের নাম সিতারা। এই ছেলে বড়ো হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেন।

তার লেখা চিকিৎসা বিষয়ক একটি বইয়ের নাম আল কানুন ফিখাল টিম্ব, এই বইটি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিল পরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়ায় কিছু কিছু তথ্যের ত্রুটি ধরা পরে কিন্তু শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে আজও রয়েছে তার কালজয়ী অবদান। কাঁধের সন্ধিচ্যুতিকে সোজা করার একটি পদ্ধতি আজও তার নামকে ধারণ করে আছে। তার বাবা ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে হবে খ্যাতনামা আইনজীবী তাই তিনি আইন বিষয়ক পড়াশুনাও করেছিলেন।

ধর্মতত্ত্ব সাহিত্য ইউক্লিক্রর জ্যামিতি। অ্যারিস্টটলের দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভারতীয় বীজগণিত ইত্যাদিতেও তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন কিন্তু তার সবচাইতে আকর্ষণ ছিল গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি গণিত ও চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই সময় তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বুখারার সুলতান কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। দেশের বড়ো বড়ো চিকিৎসক তাকে ভালো করতে পারলেন না। বিদেশ থেকে নামকরা চিকিৎসকরা এসেও রোগ ধরতে পারলেন না, একদিন আমাদের সেই তরুণ চিকিৎসক গেলেন রাজদরবারে। বললেন সুলতানের চিকিৎসা তিনি করতে চান। রাজি হলেন সুলতান এবং সেই তরুণের চিকিৎসা গুণে অল্পদিনেই সুলতান সুস্থ হয়ে উঠেন।

অত্যন্ত খুশি হয়ে সুলতান হয়ে বললেন-

হে যুবক তুমি কী পুরস্কার চাও আমার কাছে? যা চাইবে তাই তুমি পাবে- বলো?

চিকিৎসক যুবক বলল। মহামান্য সুলতান আমি কোনো আর্থিক পুরস্কার চাই না।

তবে কী চাও?

যদি দয়া করে আপনার বিশাল পাঠশালায় আমাকে পড়াশুনা করার সুযোগ দেন তাইলেই আমি খুশি হব।

সুলতান ঐ তরুণ চিকিৎসকের পাঠ্যপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হলেন, বললেন আজ থেকে এই পাঠাগারের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। যুবক ভীষণ খুশি হয়ে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিলেন এবং বিপুল উৎসাহে পড়াশুনা করতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ সেই গ্রন্থাগারে কীভাবে যেন আগুন লেগে গেলো এবং সব বই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিছু খারাপ লোক সুলতানকে বলল এই ছেলে ইচ্ছে করে গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়েছে।

সুলতান বললেন, ইচ্ছে করে কেন লাগাবে?

লোকেরা বলল, ছেলেটা খুব খারাপ সে সব বই পড়ে নিয়েছে তাই এখন আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল। সে আপনার ক্ষতি করতে চায়।

বোকা সুলতান বিশ্বাস করলেন দুষ্টু লোকগুলোর কথা এবং তাড়িয়ে দিলেন সেই তরুণ চিকিৎসককে।

তরুণ মনের দুঃখে জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে চলে এল ঘরজেম নামক রাজ্যে। ঘরজেম একটি ছোটো রাজ্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তখন ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল আর সেইসব রাজ্যের রাজা কিংবা সুলতানগণ জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তারা বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের রাজসভায় নিয়োগ দিতেন সেই তরুণ ঘরজেম সুলতানের রাজ্য চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ পেলেন। ঘরজেম রাজসভায় আরো অনেক পণ্ডিত ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বিজ্ঞানী এবং ইতিহাস লেখক আলবেরুনী। তিনি সুলতান মাহমুদের সঙ্গে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সেই সময়ের ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন।

সুলতান মাহমুদ যখন জানতে পারলেন ঘরজেম রাজসভায় বড়ো বড়ো পণ্ডিতগণ রয়েছেন, তখন ঘরজেমের সুলতানকে আদেশ দিলেন, সব পণ্ডিতদের কে তার রাজসভায় পাঠিয়ে দিতে। সেই আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ঘরজেম সুলতানের ছিল না তাই তিনি বাধ্য হয়ে সবাইকে সুলতান মামুদের রাজসভায় পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু আমাদের সেই তরুণ প্রতিভাবান চিকিৎসকের মনে হলো এই আদেশ অসম্মানজনক। তাই তিনি পথে যেতে যেতে সবার অগোচরে পালিয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পথে পথে ঘুরলেন, একসময় চলে এলেন ইরান রাজসভায়।

ইরানের সুলতান তার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন এবং তাকে সভা পণ্ডিতের পদে নিয়োগ দিলেন। কিছুদিন এভাবে কাটল। একসময় সুলতান মাহমুদ খবর পেলেন ঐ তরুণ পণ্ডিতকে ইরান রাজসভায় সভা পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। সুলতান মামুদ রেগে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি তার গুপ্তচরদের আদেশ দিলেন ঐ তরুণকে বেঁধে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য।

বুদ্ধিমান তরুণ টের পেয়ে গেলেন এবং পালিয়ে গেলেন হামদানে। সেখানে তিনি নিজের যোগ্যতায় লাভ করলেন প্রধান উজিরের পদ। হামদানে বেশ কিছুদিন সুখেই ছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্য তার সঙ্গে বার বারই করেছে পরিহাস।

হামদানের রাজপুরুষগণ এক বিদেশিকে উজিরে আযমের পদে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তার বিরুদ্ধে শুরু করলেন ষড়যন্ত্র। বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ বিরক্ত হয়ে সেচ্ছায় উজিরের পদ ত্যাগ করে আবার পথে নামলেন অজানার উদ্দেশ্যে। একসময় চলে এলেন ইস্পাহানে। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তিনি ইস্পাহানেই কাটিয়ে ছিলেন।

তার মূল্যবান গ্রন্থগুলোও ইস্পাহানেই লিখেছিলেন।

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কী জানো কে ছিলেন এই মহান পণ্ডিত?

শোনো তাহলে তার নাম আবুল আলী ইবনে সিনা যার নাম আজও পৃথিবী খ্যাত। তাঁর মতো এত বড়ো চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর কেউ ছিল না সেই সময়ে। শুধু তাই নয়, উদ্ভিদবিদ্যা-প্রাণী বিদ্যা এবং গণিতেও ছিল ইবনে সিনার বিশাল দক্ষতা। গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের অবনতির পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিতীয় কেউ ছিল না তাঁর মতো।

তাছাড়া সমসাময়িককালে ইবনে সিনা কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদও ছিলেন। তাঁর লেখা বহু কবিতা পাওয়া গেছে। মানুষ হিসেবে ইবনে সিনা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়।

স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নায়কদের মনে মনে ঘৃণা করতেন তিনি। তবু বার বার তাদের রাজরোষে পড়তে হয়েছে তাঁকে। ইবনে সিনার জীবনে কেউ ছিল না তিনি ছিলেন একা বিয়ে করেননি, কর্মক্ষেত্রই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী। মানব সেবাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কথা।

১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন তিনি। কিন্তু সমস্ত বিশ্ব এক অপূর্ব মহিমায় আজও তাঁর নামটি বহন করে চলেছে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে খুব ধুমধাম করে পালন করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর জন্ম সহস্রবার্ষিকী। তাঁর লেখা বহু বই ঐ বছর প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ক্ষণজন্মার প্রতি স্মরণীয় এই মানুষটি আমাদের সবার প্রিয়।

ওদের যত চাওয়া

রুমান হাফিজ

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের এই অপরূপ বাংলাদেশ। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই এগিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশাল অবদান রেখে চলেছে আমাদের শিশু-কিশোরেরা। তাদের মেধা আর যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে তারা বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে বার বার নিয়ে আসছে অসংখ্য সম্মান, পুরস্কার। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার বাইরে গিয়ে তারা নিত্য নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখে। যা করতে তাদের ভালো লাগে। কেউ লিখতে পছন্দ করে, আবার কেউ আঁকতে পছন্দ করে, কেউ গান গাইতে ভালোবাসে, কেউ সামাজিক কাজ করতে ভালোবাসে, কেউ নতুন কিছু তৈরি করতে পছন্দ করে। এক কথায় একেক জনের একেক রকম পছন্দ। হয়ত সবাই পরিবার, পরিবেশ এর কারণে সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। সুযোগের অভাবে কারো স্বপ্ন পূর্ণতা পায় আবার কারো না। তবুও তারা থেমে থাকেনি। স্বপ্ন দেখে নিজেকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, মা-মাটি এবং মানুষকে নিয়ে। এরকম কয়েকজন বন্ধুর কথা জানব এবার।

দেশের হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই

খাদিজা আক্তার সায়মা

নবম শ্রেণি, উইমেন্স মডেল কলেজ, সিলেট।

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাড়া একাডেমিক পড়াশোনাকে আমার কাছে রসহীন মনে হয়। প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই অংশ নিয়েছি গানের প্রতিযোগিতায়। সেবার পুরস্কার পাইনি, তবে মা বলেছিলেন- পুরস্কার না, অভিজ্ঞতাই আসল। সেই থেকে শুরু. এরপর থেকে এখনো আমি নিয়মিত অংশ নিই কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। ২০১৭ সালে জাতীয় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণে আমি সিলেট মহানগর অঞ্চলে বছরের সেরা মেধাবী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। একাডেমিক পড়াশুনার বাইরে এসব কাজে আমার পরিবারের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। যদিও আমার চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বাধা, তবুও হাল ছাড়ছি না। স্বপ্ন দেখি, আমার কাজ দিয়েই পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার।

ভৌতিক গল্প লিখতে পছন্দ করি

দেবার্পণ দত্ত ইতান

ষষ্ঠ শ্রেণি, মাস্টারমাইন্ড ইন্টা. স্কুল, চট্টগ্রাম।

আমি আরো ছোটো ক্লাসে যখন পড়তাম তখন থেকেই আম্মু আমাকে নিয়ে যেত গান শিখাতে এবং আঁকার স্কুলে। তখন থেকেই নানারকম প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। অনেক জায়গা থেকে পুরস্কারও পেয়েছি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম অ্যাকাডেমির চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় আমার চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সেদিন আম্মু অনেক খুশি হয়েছিলেন। তারচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন আমার ম্যাম রুনা তাসমিনা। তিনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। লিখতেও আমার ভালো লাগে। গল্প লিখি। আমার প্রথম লেখা যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিনের আমার খুশি আর দেখে কে! তবে ভৌতিক গল্প লিখতে বেশি পছন্দ করি।

ডুডলিং-এ আগ্রহ

মুসাররাত আবির জাহিন

একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, ঢাকা।

পড়াশোনার পাশাপাশি আমি টেন মিনিট স্কুলে ব্লগ ইন্টার্ন, ইয়ুথ কার্নিভালে ব্লগ রাইটার হিসেবে কাজ করছি। জাতীয় দৈনিকেও মাঝে মাঝে লিখি। এছাড়া ডুডলিং-এও হাত পাকাচ্ছি। আমার আঁকা ডুডল ডিজাইন নিয়ে আমাদের স্কুলের যার্গ ব্যাজ বানানো হয়েছিল। বাসা থেকে খুব একটা বাঁধা না দিলেও বলা হয় পড়ায় মনোযোগ দিতে। তবে কাজ করতে তারা মানা করেন না!

নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করব

নাহিদুল ইসলাম ইমন

একাদশ শ্রেণি, চট্টগ্রাম মডেল কলেজ, চট্টগ্রাম।

অ্যাকাডেমির পড়াশোনার বাইরে আমার সামাজিক কাজগুলো করতে খুব ভালো লাগে। তবে সব সময় তথাকথিত কাজগুলো থেকে ভিন্ন কাজগুলো করার চেষ্টা করি। বর্তমানে স্টার্ক বাংলাদেশ নামের একটি তরুণ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। এছাড়াও চট্টগ্রাম কি আ বুক ক্লাবের সহকারী সমন্বয়কারী পদে নিয়োজিত আছি। আসলে অর্জন বলতে নিজের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মতৃপ্তিকে এগিয়ে রাখব। এসব কাজে আমার পরিবার খুবই সাপোর্ট করেছে। আমি যখন ৮ম শ্রেণিতে পড়ি তখন থেকে আমি এসকল কাজে যুক্ত আছি, সেই সময় থেকে পারিবারিক সাপোর্ট পেয়েছি।

আঁকাআঁকি করতে ভালোবাসি

ইবতিদা ইদ্রিছ

দশম শ্রেণি, মগবাজার গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা।

২০১৫ সালের দিকে, প্রথম আমি গল্প লিখি এবং তা আম্মুকে দেখাই। তখন জানতাম না এইসব লেখা কোথায় দেওয়া যায়। ২০১৬ সালে আম্মু বলেন, আমার লিখা গল্পগুলো যাতে পত্রিকায় দেই। তখন থেকেই গুটিগুটি পা করে লেখার সাথে এগিয়ে চলা। ছোটোবেলা থেকে আঁকাআঁকির প্রতি ছিল তুমুল নেশা। রংতুলি পেলেই আঁকতে বসে যেতাম। তাই আম্মু আর্ট ক্লাসেও ভর্তি করেন। কিন্তু পড়ালেখার চাপে তা আর ধরে রাখা হয়নি। তবে আঁকাআঁকি নিয়মিত ছিল। প্রতিদিন না আঁকলে যেন কিছু একটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমার এই ঝোঁক দেখে আম্মু সবসময় আমাকে সব ধরনের কম্পিটিশনে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে সাফল্যও কম ছিল না। এই পর্যন্ত আসার পেছনে আম্মু অনেক সাহায্য করেছেন। পারিবারিকভাবে সাপোর্ট অনেক পাই। পড়াশোনা ছাড়া লেখালেখি, গান, গার্লস গাইড, রেড ক্রিসেন্ট, সমাজ সেবামূলক কাজ করতে ভালো লাগে।

বন্ধুরা, তোমাদের এরকম সাফল্যের খবর জানতে পেলে নবারুণ খুব খুশি হবে। লিখে পাঠাও ছবিসহ সাফল্যের নানা খবরাখবর।

ছবি ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০

ইমেইল

editornobarun@dfp.gov.bd

এসো হালদা পাড়ের গাঁয়ে

আহসানুল হক

রাত-দুপুরে আকাশ পাড়ে
তারার ঝিকিমিকি
হালদা জলে চাঁদের ছবি
যেন রূপোর সিকি !

ভোর সকালে ঘুম ভেঙে যায়
পাখপাখালির স্বরে
দুর্বা ঘাসের কচি ডগায়
শিশির কেবল ঝরে !

প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়
ফুলের বনে বনে
দখিন হাওয়া দোল দিয়ে যায়
গ্রাম-কিশোরের মনে !

গাঁয়ের বধূ যায় যে নায়র
হারান মাঝির নায়ে
দেখবে এসো শোভা এমন
হালদা পাড়ের গাঁয়ে !

তোমরা থাকো দূর শহরে
পাওনা এসব ছোঁয়া
ইট-পাথরের দালান সেথায়
শুধু কালো ধোঁয়া !

গুণধর ছেলে

জসীম মেহবুব

কী করে অঙ্ক কষি বলো?
এই মন করে খুঁতখুঁত
কখনো বা মনে হয় ওরা
কিম্ভূতকিমাকার ভূত।
ভূতগুলো হাউমাউ করে
আমাকে কামড়ে দিতে চায়
ভয়ানক লাফালাফি দেখে
বার বার পিলে চমকায়।
যদিও অঙ্ক করি ভুল
ভয় নেই কোনো কিছুতেই
একটু বাজিয়ে দেখ তবে
হারাব না একদম খেই।
আমি যেটা পারি সহজেই
সে কাহিনি মন দিয়ে শোনো
সবকিছু ভালো করে জেনে
খুব বেশি দোষ দেবে কোনো?
কোন গাছে আম পাকে ক'টা
ঘুঘু পাখি ক'টা ডিম পাড়ে
জানি আমি রুই কাতলেরা
কোন কোন মাসে ডিম ছাড়ে।
মাছরাঙা কোন ডালে বসে
টুপ করে ছোটো মাছ ধরে
বকুল কামিনী কোন মাসে
সুগন্ধে মৌ মৌ করে।
পুষিটার ক'টা ছানা সাদা
ক'টা ছানা কুচকুচে কালো
ঘুটঘুটে রাত্তিরে কারা
বনে জ্বালে টিমটিমে আলো।
আমি জানি পুকুরের জলে
বৃষ্টিতে উৎসব চলে
আকাশের তারাদের নাম
মুখস্ত দিতে পারি বলে।
এত কিছু জানি, তবু হায়
অঙ্কটা লাগে গোলমেলে
সেই আমি মাঠ-নদী-ঘাটে
দেখো কত গুণধর ছেলে।

মো. আমিমুল ইহসান বসুনীয়া, প্রথম শ্রেণি, সাউথ আইডিয়াল স্কুল, মুগদা পাড়া, ঢাকা

নিবন্ধ

আমার কিছু কথা আছে

দাদি প্রায়ই বলেন, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। আচ্ছা, আকাশ তো তুলো তুলো মেঘ দিয়ে তৈরি। মাথায় ভেঙে পড়ার আগেই তো মেঘগুলো ভেসে ভেসে চলে যাবে। আর যদি ভেঙে পড়েই, আমরা কি ব্যথা পাব? আকাশের ওজন কত, জানা দরকার। তাহলে বুঝতে পারব, ব্যথা পাব কী পাব না।

------ওয়াহিদ ইবনে রেজা, পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

নবারুণ: আহা, কী সুন্দর প্রশ্ন! হেমন্তের ঝকঝকে রোদমাখা আকাশ খুব খুশি হয়েছে তোমার প্রশ্ন পেয়ে। এরপর লেখক রবিউল কমলকে অনুরোধ করেছে আকাশের ওজন কত, তা তোমাদেরকে জানানোর জন্য। দেখ তো, তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে কী না। আর শোনো, এরকম মজার মজার প্রশ্ন কিন্তু নবারুণকে আরো করো, কেমন?

আকাশের ওজন কত?

রবিউল কমল

পৃথিবী যে এত সুন্দর, তার অন্যতম কারণ হলো আকাশ। আকাশে আছে মেঘ, মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। আবার রাতের আকাশে থাকে কত তারা! একেক তারার আছে একেক নাম। বিভিন্ন ঋতুতে কিংবা দিনের বিভিন্ন সময় আকাশের থাকে একেক রং।

ভূপৃষ্ঠের বাইরের দিকে যে বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্য রয়েছে তা আকাশের অংশ। কিন্তু কখনো কি ভেবেছো আকাশের ওজন কত, নাকি ওজনহীন?

মজার কথা হলো, আকাশের ওজন আছে। কারণ আকাশে আছে বাতাস, আর বাতাস হলো সব ধরনের বায়বীয় অণু দিয়ে তৈরি। বাতাসের ওই অণুর মোট ওজনই আকাশের ওজন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি আকাশের ওজন থাকেই তাহলে পৃথিবী ওই ওজন কীভাবে বহন করে?

পৃথিবীর পুরো পৃষ্ঠজুড়ে বাতাসের ওজন সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে, তাই এটি সবদিক থেকে পৃথিবী ও মানবদেহের ওপর চাপ দেয়।

যদি আমাদের মাথার উপরই এ চাপ পড়ত, তাহলে আমরা মাটিতে পড়ে যেতাম। বাতাস চারদিক থেকে আমাদের দেহে চাপ দেয় বলেই আমরা পড়ে যাই না। মানবদেহের ওপর বাতাসের এ চাপকে বলা হয় বায়ু চাপ। বায়ু চাপ মাপার যন্ত্রের নাম মনে আছে তো! হ্যাঁ, ব্যারোমিটার।

ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বাতাসের গড় ওজন ১৪.৭ পাউন্ড বা ৬.৬ কেজি যা প্রায় ১১ বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড বা ৫.২ মিলিয়ন বিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মানে হলো পৃথিবীর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আকাশের আয়তন ১৪.৭ পাউন্ড যা প্রায় ১১ বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড।

তাই, আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর ভরের এক মিলিয়ন হলো আকাশের ওজন। অর্থ্যাৎ আকাশের ওজন ৫৭০,০০০,০০০,০০০,০০০টি ভারতীয় হাতির সমান!

ঘুড়ি

গিয়াস উদ্দিন রূপম

দূর আকাশে উড়ি
আপন মনে ঘুরি
নেইত আমার জুড়ি।
লাটাই!
করছি তাকে ছাঁটাই
দিচ্ছি বিদায় টাটা-ই
স্বাধীন সময় কাটাই।
আমি
চাঁদকে ডাকি 'মামি'
সূর্যালোকে ঘামি
নিচে কি আর নামি!
আমার
এই এলাকা মামার
নেই প্রয়োজন থামার
মাটির বুকে নামার।
বা-রে
এই যে আকাশ পাড়ে
এমনি বারে বারে
উড়তে কি কেউ পারে?
এ কী!
আকাশ কালো দেখি
বাজছে মেঘে ঢেঁকি
কোথায় তবে ঠেকি?
ওরে!
বইছে বাতাস জোরে
বড্ড মাথা ঘোরে
গেলাম বুঝি পড়ে।
মামা!
ভিজছে শরীর-জামা
বৃষ্টি বাতাস থামা
জলদি নিচে নামা।
বড়াই!
জল-কাদাতে গড়াই
লাটাইবিহীন লড়াই?
না না, আমি ডরাই!

বর্ষার বিরুদ্ধে শরতের মামলা

বিএম বরকতউল্লাহ্

বর্ষার বিরুদ্ধে শরৎ ঋতু
মামলা দিয়েছে ঠুকে
অভিযোগ তার বর্ষা ঋতু
সাজানো বাগানে ঢুকে-

সবকিছু সে তছনছ করে
ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো
যখন তখন আসবি না তুই
নিষেধ করেছি শত।

অথচ সেই বর্ষাকাল
পেরিয়ে গেছে কবে
শরতের কালে গোঁয়ার বর্ষা
আসবে কেন তবে?

আমার সাজানো বাগান বর্ষা
করেছে লণ্ডভণ্ড
সবকিছু শুনে বসন্তরাজ
বর্ষাকে দেয় দণ্ড।

দণ্ড খেয়ে বর্ষা এখন
সুযোগ পেলেই ধমকায়
শান্ত শরৎ গর্জন শুনে
ভয়েতে পিলে চমকায়।

ছয়টি ঋতু সত্যি প্রয়োজন

মাযহারুল ইসলাম অনিক

ভাদ্র আশ্বিন দু মাস মিলে একটি ঋতু আসে,
নদীর দু কূল যায় ভরে শুভ্র কাশে কাশে।
মল্লা মাঝি গান ধরেছে নানান সুরে সুরে,
দুঃখগুলো যাচ্ছে দেখো পাখির মতো উড়ে।
বৃক্ষগুলো দিচ্ছে দেখো নানান রকম ফুল,
সাদা মেঘে উড়ছে দেখো ঐ যে পক্ষিকূল।
কিন্তু এখন কালো ধোঁয়াই সব করেছে শেষ,
মাসের পরে মাস চলে যায় পায় না ঋতুর রেশ।
তাইত বলি সবাই শোন সবুজ করি রোপণ,
মনের মাঝে দুঃখগুলো হবে দেখো গোপন।
সুস্থভাবে বাঁচতে হলে চায় যে সতেজ মন,
ছয়টি ঋতু তারই সাথে সত্যি প্রয়োজন।

দ্বাদশ শ্রেণি, ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপাল কলেজ যশোর।

গল্প

ফুলপরি

সারমিন ইসলাম রত্না

ফুলপরির মন খারাপ। আজ কতদিন হলো বাগানে ফুল ফুটে না, ফুলকলিগুলো সারাদিন চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে, পাখিরা গান গায় না, প্রজাপতিরা ফুলের পাপড়ির মতো পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় না, মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যায় না। বাগানের একমাত্র ঝরনাটাও ঝরঝর করে ঝরে পরে না। অন্য বাগানের ফুলপরিরা এসে অবাক চোখে দেখতে লাগল বাগানটা। বাগানে কোনো ফুল নেই, কলিরা সব ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু কেন?

এমন সময় কোথা থেকে উড়ে এল দমকা বাতাস। এসে ফুল পরিদেরকে বলল, এ বাগানের মালিক বেশ কিছুদিন ধরে খুব অসুস্থ তাই তিনি বাগানের পরিচর্যা করতে পারছেন না, তাই ফুল ফুটছে না।

হঠাৎ বাগানে উপস্থিত হলো ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে। বাগানের ভিতর এতগুলো পরিকে একসঙ্গে দেখে সে চমকে উঠল, সে জীবনে কোনো দিন পরি দেখেনি,পরিরা কত্ত সুন্দর হয়।

একটি ফুলপরি বলল, বাহ! কী সুন্দর মেয়ে!

আর একটি ফুলপরি বলল, তোমার নাম কী? তুমি কোথায় থাক?

মেয়েটি বলল, আমার নাম রানি। এই যে দেখছ ঘর, আমি এখানেই থাকি। বাবা বলেন, আমি এই বাগানের রানি।

পরিরা সবাই একসাথে রানিকে কুর্নিশ করে বলল, তাহলে তো তুমি আমাদেরও রানি। ছোট্ট রানি আরো বলল, আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই, স্কুল থেকে ফিরে এসে মাকে তার কাজে সাহায্য করি। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে আমাকে যেতে হয় নাচের ক্লাসে, গানের ক্লাসে, সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। বাসায় এসে হোমওর্য়াক করি। এভাবেই আমার দিন কাটে, রাত কাটে। আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু আজ আমি শুধু এই বাগানের পরিচর্যা করব।

ফুলপরিদের খুব লজ্জা হলো। কী ছোট্ট মেয়ে অথচ সে কত কিছু করে। আর ওরা আরাম আয়েশে শুধু নেচে গেয়ে বেড়ায়। তারা ছোট্ট রানিকে বলল, আমরাও তোমার সাথে বাগানের পরিচর্যা করব। দমকা বাতাস বলে উঠল, আমিও আছি তোমার সাথে।

তারপর রানি, ফুলপরি আর দমকা-বাতাস সবাই লেগে গেল বাগান পরিচর্যার কাজে। তারা বাগানের প্রতিটি গাছের গোড়ায় গোড়ায় আগাছাগুলো পরিষ্কার করে দিল, গাছের মরা ডালপালাগুলো পরম যত্নে কেটে দিল। দমকা বাতাস বলল, দাঁড়াও আমি এক পশলা বৃষ্টিকে ডেকে নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পরেই এক পশলা বৃষ্টি এসে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিল সবাইকে, স্নিগ্ধ হয়ে উঠল পুরো বাগান। গাছে গাছে দেখা দিল সবুজ সতেজ নতুন পাতা। কলিগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল,তারপর ফুলপরিদের আলতো ছোঁয়ায় ফুটে উঠল ফুল হয়ে। দমকা বাতাসের আলোড়নে নেচে উঠল সবাই। আনন্দে নেচে উঠল ছোট্ট মেয়ে রানি। ফুলপরিরাও রুনুঝুনু নূপুর পায়ে সারা বাগান জুড়ে শুরু করে দিল নাচ-গান। তাদের সাথে যোগ দিল পাখিরা, প্রজাপতি আর মৌমাছিরা। বাগানের ঝরনাটিও ছন্দে-আনন্দে ঝরঝর করতে শুরু করল।

এমন সময় সেখানে দমকা বাতাস এসে বলল, আমি দেখে এসেছি আরেকটি বাগান, পরিচর্যার অভাবে মৃতপ্রায়।

রানি সবাইকে নিয়ে হাজির হলো সে বাগানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে মিলে ফুটিয়ে তুলল হাজারো ফুলের সমারোহ। প্রাণের আনন্দ ছড়িয়ে পরল সারা বাগানময়।

এভাবে ছোট্ট রানি ও পরি দমকা বাতাসকে সাথে নিয়ে ঘুরতে লাগল বাগান থেকে বাগানে। তাদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোটো ছোটো শিশু-কিশোরেরা। সবাই নিজেদের বাগান পরিচর্যায় মন দিল। শুধু তাই নয় যাদের কোনো বাগান ছিল না তারাও নতুন করে বাগান করতে শুরু করল। ফুলে ফুলে ভরে উঠল চার দিক। কী যে সুন্দর হয়ে উঠল, সবকিছু!

বন্ধুরা, তোমরা তো অনেক ফুলের নাম জানো, তাই না? বিজয় ফুলের নাম কি জানো? ভাবছ এটা আবার কেমন ফুল! হ্যাঁ ছোট্ট বন্ধুরা, এবার বিজয়ের মাসে আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা হবে 'বিজয় ফুল'।

বন্ধুরা, প্রতিবছর বিজয় দিবসের এই দিনটিকে উদ্‌যাপন করো স্কুলে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে। হৃদয়ে ধারণ করো আমাদের মহান এই অর্জনকে। কিন্তু এবারের বিজয় দিবসে নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানাবার জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে 'বিজয় ফুল' তৈরি প্রতিযোগিতা ও 'বিজয় ফুল' উৎসব। শিশু শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে কোটি কোটি 'বিজয় ফুল'। এছাড়া শিশুদের তৈরি এই বিজয় ফুল শুভেচ্ছা মূল্যে বিক্রি করাও হবে। ফুল বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও বিশেষ শিশুদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে।

জাতীয় ফুল হিসেবে শাপলাকে 'বিজয় ফুল' হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই বিজয় ফুল তৈরি করা হবে কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক শিটসহ অন্য যে-কোনো সামগ্রী ব্যবহার করে। সবুজ জমিনে সাদা রং-এর ম্যাটেরিয়ালে তৈরি হবে বিজয় ফুল। এর দৈর্ঘ্য ছয় সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ আনুপাতিক হারে। ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল বীজ বপন করেছিল। এ কারণে বিজয় ফুলে পাপড়ি হবে ছয়টি। আর কলিটি হবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ নিয়ে। মনে হবে, বঙ্গবন্ধু ফুলের কলি হয়ে ফুটে আছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে এই বিজয় ফুল। বিজয় ফুল তৈরির পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা ও শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

বিজয় ফুল তৈরির প্রতিযোগিতা ১৭ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই ফুল তৈরি করে তাদের বন্ধুবান্ধব ও সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে ১৩ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয়ভাবে ঘোষণা করা হবে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর দেশসেরা শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নিবন্ধ

বুদ্ধির খেলা

আনোয়ারা বেগম

আজ ৮ই আগস্ট। ঘুম থেকে উঠেই প্রথম আলো পত্রিকাটি পড়ছি। ৭ম পাতায় যেতেই দেখলাম 'ধরা পড়ল বন্যপ্রাণীর বড়ো চালান' শিরোনাম। বিমানবন্দরে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কার্গো ভিলেজ থেকে ২৫টি বাক্স উদ্ধার করে। এই বাক্সগুলোর মধ্যে ছিল ১৫টি ম্যাকাউ, ৩০টি আফ্রিকান গ্রে, প্যারট, ৬৫২টি লাভ বার্ড, ৮টি ময়ূর, ১২টি কমন মারমুসেট মাংকি, ২টি লেমুর, xটি সানকুনিওর, ৯টি গ্রে কুনিওর ও ৪টি ব্লাক ক্যাপ কুনিওর। খেয়াল করো সানকুনিওর এর সংখ্যা xটি লেখা হয়েছে।

খুব মনোযোগ সহকারে পড়লাম প্রতিবেদনটি। তোমাদের কথা মনে হয়ে গেল। তাই চিন্তা করলাম তোমাদের জন্য প্রতিবেদন থেকে কোনো বুদ্ধির খেলা বের করা যায় কিনা।

এই পশুপাখিগুলো দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সাইটিস অনুসারে বিপন্ন তালিকাভুক্ত প্রাণীদের আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নন-ডেট্রিমেন্টাল রিপোর্ট ও বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ মোতাবেক জীবন্ত পশুপাখি বন অধিদপ্তরের অনাপত্তি নিয়ে আমদানি করতে হয়। কিন্তু এই প্রাণীগুলোকে বন অধিদপ্তরের অনাপত্তি ছাড়াই আমদানি করা হয়েছে তাই তাদেরকে আটক করা হয়েছে। এই আটককৃত বন্যপ্রাণী ও পাখিগুলো ৭ই আগস্ট গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে দেওয়া হয়েছে।

তোমরা হয়ত অনেকে সাফারি পার্কে গিয়েছ। সেখানে খুব কাছ থেকে বাঘ, সিংহসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে বন-জঙ্গলে বিচরণরত অবস্থায় দেখেছ। যারা যাওনি, তারাও যেও। তখন দেখবে ওরা ধেয়ে আসছে তোমার দিকে। মনে হবে, এই বুঝি ধরে ফেলল।

ভয় পাবে না। কারণ তুমি তো সাফারি বাসে চড়ে এগুলোকে পরিদর্শন করবে। তোমাকে কিছুই করতে পারবে না। তুমি তাদেরকে দেখবে আর আনন্দ উপভোগ করবে।

সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণী শুধু সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করা হয়নি। এদের প্রজনন, বংশবিস্তারের ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষা গবেষকদের জন্য গবেষণার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পার্কটি কিন্তু বেশি দূরে নয়। ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ কি.মি. উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘেরবাজার থেকে প্রায় ৩ কি.মি. পশ্চিমে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। পার্কটি সপ্তাহে শুধু মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। তোমরা অনায়াসে যে-কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাবা-মামা-ভাই-বোনদের নিয়ে চলে যেতে পারো বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে।

এবার চলো দেখা যাক বুদ্ধির খেলা কীভাবে খেলা যায়। প্রতিবেদনে সানকুনিওর একটি সংখ্যা ছিল আমি সেটাকে xটি লিখেছি। তোমরা হয়ত অনেকেই প্রতিবেদনটি পড়েছ। ফলে সংখ্যাটি জানো। টিপু ও দিপু দুই ভাইয়ের মধ্যে টিপু সংখ্যাটি জানে। কারণ সে প্রতিবেদনটি পড়েছে। কিন্তু দিপু সংখ্যাটি জানে না। তাই টিপু দিপুর বুদ্ধির পরীক্ষা করবে। কারণ দিপু সবসময় নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবে।

টিপু দিপুকে ডেকে বলল, তুমি তো নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবো। আজকে তোমার বুদ্ধি দিয়ে বের করতে হবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়া প্রাণীদের মধ্যে সানকুনিওর সংখ্যা কয়টি?

দিপু বলল, ভাইয়া সংখ্যাটি কয় অঙ্কের?

টিপু বলল দুই অঙ্কের।

তাহলে এটা কোনো ব্যাপারই না। তুমি শুধু একটা খাতা ও কলম নিয়ে একটু যোগ-গুণ করো, তাহলে আমি তোমাকে সংখ্যাটি বলে দিচ্ছি বুদ্ধি দিয়ে। খাতার উপরে সানকুনিওর পাখির সংখ্যাটি লেখ। দশকের স্থানের অঙ্কটির সাথে ১ যোগ করে যোগফলকে ২ দিয়ে গুণ করো। গুণফলের সাথে ৩ যোগ করে যোগফলকে

৫ দিয়ে গুণ করো। এবার গুণফলের সাথে এককের অঙ্কটি যোগ করে আমাকে যোগ ফলটি বলো।

টিপু বলল যোগফল হয়েছে ৬২। দিপু সাথে সাথে উত্তর দিল ৩৭টি সানকুনিওর ছিল।

টিপু বলল কীভাবে বের করলে?

দিপু বলল বুদ্ধিটা হলো দুই অঙ্কের যে-কোনো সংখ্যা নিয়ে আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে যোগ ও গুণ করার পর যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তার থেকে ২৫ বিয়োগ করলেই কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। ভাইয়া তুমি সংখ্যাটি বলেছিলে ৬২। আমি তার থেকে মাত্র ২৫ বিয়োগ করে বলে দিয়েছি সানকুনিওর সংখ্যা ৩৭।

সানকুনিওর সংখ্যা ৩৭। দিপু দশকের স্থানে অঙ্কটির (৩) এর সাথে এক যোগ করলে হয় ৪। এর দ্বিগুণ করে পাওয়া গেল ৮। এবার ৮-এর সাথে ৩ যোগ করে যোগফল হলো (৮+৩) = ১১। যোগফলকে ৫ দিয়ে গুণ করে গুণফল পাওয়া গেল ৫৫। গুণফলের সাথে ৭ যোগ করে যোগফল পাওয়া গেল ৬২। তোমার যোগফল থেকে ২৫ বিয়োগ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিলাম সানকুনিওর সংখ্যা ৩৭।

ছোটো বন্ধুরা, এবার তোমরা নিজেরা নিজেরা যে-কোনো দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে খেলাটি খেলতে পারো এবং দিপুর মতো নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবতে পারো।

নিবন্ধ

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বাংলাদেশের একটি বিভাগ ৩. তরকারির একটি উপাদান ৪. এক ধরনের ফল ৬. এক ধরনের গ্রামীণ খেলার উপকরণ ৮. অর্ধ-মাস ৯. অপরের জন্য অনুরোধ করা ১০. মৃত্তিকা ১১. বাঁশ বা হালকা কাঠের সিঁড়ি ১৩.আলো ১৪. জামা

উপর-নিচ: ১. ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম ২. এক ধরনের সবজি ৩. কপাল ৪. পুকুরে জন্ম নেওয়া এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ ৫. বুক ৭. সরীসৃপ জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী ৮. পশুর লোম ১২. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ

১		২			৩		
				৪			
							৫
৬	৭					৮	
			৯				
১০						১১	১২
	১৩						
					১৪		

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	+		-	৭	=	
+		+		+		+
	+	৩	-		=	৪
-		-		-		-
৬	+		-	৫	=	
=		=		=		=
	+	৫	-		=	৬

সমাধান পাঠিয়ে দাও ৩১শে অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ভেতর এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড

ঢাকা-১০০০।

ইমেইল : editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিঠা বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বনাঞ্চলী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বন্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 4, October 2018, Tk-20.00

নূরতাজ জাহান জুঁই, সপ্তম শ্রেণি, এস.ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা